শকুন্তলা স্যানাটোরিআম

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু
(অ-কৃ-ব)

কল্লোল প্রকাশনী
কলিকাতা - ১২

প্রথম সংস্করণ :
১৫ই ভাদ্র,
১৩৬৭

প্রকাশিকা :
শ্রীমতী শোভা রায়
কল্লোল প্রকাশনী
এ-১৩৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক :
শ্রীগজেন্দ্রনাথ চৌধুরী
প্রিন্টার্স কর্নার প্রাইভেট লিঃ
১, গঙ্গাধর বাবু লেন
কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদপট শিল্পী :
শ্রীবেণুধর ভট্টাচার্য

মূল্য : দুই টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

ডাক্তার ত্রিলোচন ত্রিপাঠী লিখেছিলেন "চলে এসো। বিনা দ্বিধায়।" চলে এসেছি। দ্বিধা করিনি। ট্রেনে ভিড় ছিল, ভ্রূক্ষেপ করিনি। ডাক্তার ত্রিলোচন ত্রিপাঠীকে আমি শ্রদ্ধা করি।

মগজের বিকার ও বিকৃতি সম্বন্ধে ডাক্তার ত্রিপাঠী একজন নামজাদা বিশেষজ্ঞ। দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে তিনি বিদেশে গিয়েছিলেন মগজের বিকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান আহরণ করে আনবার জন্যে। মোটা মোটা বিদেশী ডিগ্রী আর অভিজ্ঞতা নিয়ে আবার ফিরে এসেছেন দেশের গণ্ডির ভেতরে, দেশের লোকের শ্রদ্ধা পাচ্ছেন বিস্তর। সেটা যে শুধু বিদেশী ডিগ্রিগুলোরই জন্যে, সে কথা বললে তাঁর এবং তাদের অযথা অপমান করা হবে।

ভারতের একটি শৈল-বিশ্রাম অথবা হিল স্টেশন। সেটির নাম অনায়াসেই বলে দেওয়া যেতে পারত, কিন্তু না বললেও কোনো ক্ষতি হবে না। সেই শৈল-বিশ্রামের বুকে বিশ্রাম করছে একটি লম্বা-চওড়া স্যানাটোরিআম, যার অতিথিদের কারো মন সাধারণ বাঁধা সড়ক বেয়ে চলে না; সাধারণ পথের সীমানা ছাড়িয়ে যখন তখন পা বাড়ায় অসাধারণ বিপথে। এই অসাধারণত্বই তাঁদের এখানকার আতিথ্যের কারণ।

গোটা স্যানাটোরিআমের ব্যয়-বাহক পৃষ্ঠপোষক কোটিপতি শেঠ কিষেণলাল ভরদ্বাজ, তাই সরকারী বদান্যতার প্রয়োজন বোধ বা কামনা করেনি স্যানাটোরিআম। প্রথম যৌবনে শেঠজী লক্ষপতি

হয়েছিলেন, এখন কোটির নিচে কান পাততে রাজী নন। তিনিও স্যানাটোরিআমের একজন পাকাপোক্ত অতিথি।

স্যানাটোরিআমে নিজের বাংলোর পাশের বাংলোতে আমার থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন ডাক্তার ত্রিপাঠী। সঙ্গে মালপত্র বিশেষ কিছু আনিনি, শুধু একটা স্যুটকেসে কিছু কাপড়-চোপড় আর ডায়েরি লিখবার মোটা বাঁধানো খাতা।

ডাক্তার ত্রিপাঠী এই স্যানাটোরিআমের সর্বাধিনায়ক, যাকে ইংরেজদের ভাষায় বলে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্। তাঁর সহযোগিতায় আছেন একাধিক ডাক্তার এবং ততোধিক নার্স প্রভৃতি। কিন্তু অত খুঁটিনাটির ভেতর যাবার দরকার নেই। এখানকার পুরো ক্যাটালগ লিখতে বসিনি।

এখন একটু কিষেণলাল ভরদ্বাজের কথা বলি। বিরাট বাগানের ঈশান কোণে কিষেণলালের বাংলো। তার সেরা দক্ষিণবাতায়নী কামরায় আরাম কেদারায় দেহ এলিয়ে দিয়ে আরাম করছেন কিষেণলাল। আমি আমার খোলা জানালা থেকে দেখছি তাঁকে। কখনো আপন মনে হাসছেন, কখনো বা গম্ভীর হয়ে যাচ্ছেন।

"শেঠ কিষেণলালের পুত্র ছিল একাধিক, কন্যা মাত্র একটি।" বললেন ডাক্তার ত্রিপাঠী। "কুমারী শকুন্তলা ভরদ্বাজ। শকুন্তলা প্রথমে ছোট ছিল, কিন্তু নিত্য উধাও কালের যাত্রার রথ তাকে ছোট থাকতে দিলে না। শকুন্তলার দেহে মনে এলো যৌবনের জোয়ার। এদিকে বাপের অগাধ টাকা। অনেক ধনকুবেরের দুলাল শকুন্তলার প্রেমে হাবুডুবু খেতে লাগল, কিন্তু বড়লোকের ছেলেতে রুচি নেই শকুন্তলার। সে চাইলে গরীব প্রেমিকের প্রেম। কোথায় সেই গরীবের ছেলে, যে প্রেমে পড়বে শকুন্তলার, যার প্রেমে পড়বে শকুন্তলা? কোথায়? কোথায়? শকুন্তলার চিত্ত উদাস হয়ে উঠলো সেই না-জানা প্রেমিকের জন্যে। এমনি সময় শকুন্তলার জীবনে এলো

হুষ্মন্ত তেন্দুলকার।”

“গরীব?”

“শুধু গরীব নয়, তার ওপর দেদার দেনাগ্রস্ত।”

“গরীবকে ধার দিলে কে?”

“হুষ্মন্তের বাক্‌জালে যাঁরা মুগ্ধ হলেন তাঁরাই। শেষ পর্যন্ত শকুন্তলাও। টাকা যত চাইতে লাগল তত দিতে লাগল শকুন্তলা, খুশী হয়ে নিতে লাগল হুষ্মন্ত। কিন্তু হুষ্মন্ত যা চেয়েছিল তার চাইতে বেশী দিয়ে ফেলেছিলো শকুন্তলা—টাকার সঙ্গে হৃদয়। সেইটি টের পেয়েই বিগড়ে গেল, বেঁকে বসল হুষ্মন্ত তেন্দুলকার। বললে—টাকা ধার চেয়েছিলাম, যখন পারি শোধ করবো বলে—কারণ না পারলেও তোমার কিছু আসবে যাবে না। হৃদয় নেবার বা দেবার তো কোনো কথা ছিল না।”

কচের পেছনে দেবযানীর মত হুষ্মন্তকে অতিষ্ঠ করে তুলল শকুন্তলা। অতি-রোমান্টিক শকুন্তলা। পাগল হয়ে উঠল তার চিত্ত হুষ্মন্তের জন্যে। কি যে দেখেছিল হুষ্মন্তের ভেতর, তা সেই জানে।

হুষ্মন্ত শেষকালে একসঙ্গে শকুন্তলার কাছ থেকে মোটা টাকা নিয়ে কোথায় উধাও হয়ে গেল। ইংরাজিতে টাইপ করে শকুন্তলাকে একখানা চিঠি ডাকে পাঠিয়ে দিলে, তাতে লেখা “ভুলে যাও আমাকে।” তলায় কোনো দস্তখৎ নেই। হাতের লেখা কোনো দলিল শকুন্তলার হাতে তুলে দিতে রাজী নয় হুষ্মন্ত।

হুষ্মন্ত-অভাবে ম্রিয়মানা শকুন্তলা—শেষটায় একদিন ভরদ্বাজ ভবনের তেতলা থেকে শানবাঁধানো ফুটপাথে পড়ে মারা গেল। সন্দেহ করা গেল শকুন্তলার এই অধঃপতন ও মৃত্যু দুর্ঘটনা বটে, কিন্তু ‘অ্যাক্‌সিডেন্ট’ নয়। শকুন্তলা ইচ্ছা করেই লাফিয়ে পড়েছিল, যদিও এই ইচ্ছাটা তার মনের সুস্থ অবস্থায় হয়নি বলেই অনেকের ধারণা। কেউ কেউ শেঠজীকে বলেছেনও সময়মতো কোনো ভালো মনের-

ডাক্তার দেখিয়ে শকুন্তলার মনটা ঠিক করিয়ে নিলেই এ দুর্ঘটনাটা ঘটত না, শকুন্তলা আজও বেঁচে থাকত। আর কেউ কেউ মনে মনে বলেছেন "শকুন্তলার মাথা আগেই খারাপ হয়েছিল, নইলে কি আর ঐ দুষ্মন্ত চোঁড়াকে অমন— ?"

পুত্রেরা আগেই মরে গিয়েছিল, বাকী ছিল একমাত্র সন্তান শকুন্তলা। সেও মরে যেতে মন খারাপ হয়ে গেল শেঠ কিষেণলালের, আর তাই থেকে দেখা দিল একটু একটু মাথা খারাপের লক্ষণ। এলেন নামকরা বিদেশ ফেরত মনের ডাক্তার ত্রিলোচন ত্রিপাঠী; মনের ডাক্তারীতে যাঁর তুলনা নেই সারা ভারতে।

"তারপর শেঠ কিষেণলালের টাকায় আর আমার পরিচালনায় গড়ে উঠল পাহাড়ের বুকে এই শকুন্তলা স্যানাটোরিআম।" বললেন ডাক্তার ত্রিলোচন ত্রিপাঠী। "মনের দুঃখে সংসার ছেড়ে, ব্যবসা-বাণিজ্যের জগত থেকে বাণপ্রস্থ নিয়ে তিনিও এসে কায়েমী আশ্রয় নিলেন এই আশ্রমে। বিরাট ভরদ্বাজী ব্যবসা বাণিজ্যের কর্ণধারগিরি ছেড়ে দিলেন তাঁর উপযুক্ত ভাইপো এবং বিপুল ঐশ্বর্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী চন্দনমল ভরদ্বাজের হাতে। চন্দনমল যেমন অসামান্য পাকা কর্ণধার, তেমনি অসাধারণ জ্যাঠাভক্ত। শেঠ কিষেণলালের যে কোনো হুকুম অবিলম্বে অম্লান বদনে বিনা দ্বিধায় পালন করে। এই স্যানাটোরিআমের পেছনে জলের মতো দুহাতে টাকা খরচা করছেন শেঠজী, চন্দনমলের তরফ থেকে কোনোরকম বাধা আসছে না। অনেকে চন্দনমলকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে শেঠজীর এই টাকাওড়ানো খামখেয়াল তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বন্ধ করা দরকার; কি হবে এক ঝাঁক পাগল পুষে বছর বছর টাকার শ্রাদ্ধ করে? চন্দনমল হেসে বলেছে "টাকার শ্রাদ্ধ নয়, পাগল পোষা নয়, এ হচ্ছে দামী গবেষণা। এই মহা গবেষণার পৃষ্ঠপোষকতা করছেন জ্যাঠামশায় শেঠ কিষেণলাল। এর সুফল মিলবেই একদিন।"

এই স্যানাটোরিআমের বাসিন্দারা সাধারণ সস্তা পাগল কেউ নয়, অসাধারণ নমুনা ছাড়া এখানে কাউকে অতিথি করে আনিনে আমি। তাই এ স্যানাটোরিআমকে হাল্‌কা ভাষায় বলতে পারো বিচিত্র চরিত্রের চিড়িয়াখানা।"

বললাম "কৌতূহল হচ্ছে খোদ কিষেণলালজীর সঙ্গে আলাপ করবার।" "সোজা চলে যাও।" বললেন ডাক্তার ত্রিপাঠী। গেলাম। "আসুন ধনপতি বাবু।" বললেন শেঠজী। আমি বললাম "চেনেন না কি আমাকে?" শেঠজী বললেন "আসবেন শুনিয়েছিলাম ডাক্তার ত্রিপাঠীর মুখে।" তারপর এমন সহজভাবে কথা কইতে লাগলেন যেন কোনো দিনই তাঁর সঙ্গে অপরিচিত ছিলাম না। কিছুক্ষণ আলাপের পর শুধালেন "ডাক্তার ত্রিপাঠীকে কেমন মনে লাগছে?"

আমি বললাম "ভালোই তো।"

শেঠজী হেসে বললেন "পাগল।"

"পাগল?"

"খাঁটি পাগল। সেই জন্যেই তো ওঁরই উপরে এই স্যানাটোরিআমের জিম্মেদারি।"

বলে মহা আনন্দে হো হো করে হেসে উঠলেন শেঠ কিষেণলাল ভরদ্বাজ। তারপর হাসি থামিয়ে বললেন "প্রফেসর ট্যাল্‌পেট্রো আসছেন। গ্রেট রয়েল বেঙ্গল সার্কাসের গ্রেট প্রফেসর ট্যাল্‌পেট্রো।"

"আইয়ে ট্যাল্‌পেট্রোজি।" বলে প্রফেসর ট্যাল্‌পেট্রোকে অভ্যর্থনা করলেন শেঠজী। "বুকমে ইতনা মেডেল ঝুলায়া?"

প্রফেসর বললেন "এ হামারা বুক নেহি শেঠজি, গ্রেট রয়েল বেঙ্গল সার্কাসকা সাইনবোর্ড হ্যায়। হাম তো আপন বোল্‌কে কুছ নেহি রাখা, সব কুছ সার্কাসকো উৎসর্গ কর্‌ দিয়া।"

পাঁচ বছরে চেহারা বিশেষ বদ্‌লায়নি প্রফেসর ট্যাল্‌পেট্রোর,

শুধু হয় তো স্বভাব-বিষণ্ণ চেহারা একটু বিষণ্ণতর হয়েছে, হাল্‌কা গোঁফের হাল্‌কাত্ব বেড়েছে একটু। সেই পুরাতন কোটে সেই পুরাতন মেডেলগুলোই ঝুলছে। মনে পড়ে গেল সেই অতীত সন্ধ্যার সার্কাসের আসরে কালো কোটের বুকে এক ঝাঁক সাদা মেডেল ঝুলিয়ে এসে সার্কাসের মালিক ম্যানেজার প্রফেসর ট্যাল্‌পেট্রো জানানী দিচ্ছেন ঃ এইবার শুরু হবে অতুলনীয় গাধার খেলা— "দি গ্রেট ডংকি অ্যাক্‌ট্‌", পরিচালনা করবেন 'দি গ্রেট লায়ন-টেমার' মিস রেবেকা।

"ইন্‌কে সাথ পরিচয় কিজিয়ে ট্যাল্‌পেট্রোজি।" শেঠজী বললেন আমাকে দেখিয়ে। প্রফেসর আমাকে এতক্ষণ খেয়াল করেননি। কি একটা উত্তাল ভাবতরঙ্গ তাঁকে ভয়ংকর আন্‌মনা করে রেখেছিল।

"হাঁ হাঁ, অবশ্য করেগা, শেঠজি।" লজ্জিত হয়ে বললেন প্রফেসর ট্যাল্‌পেট্রো। বলে আমার কাছে হয়তো ক্ষমা চাইতেন, কিন্তু সেই ক্ষমা চাওয়ার গোড়া মেরে দিয়ে শেঠজী আমার পরিচয় দিলেন :

"ধনপতি বাবু। ডক্‌টরজীকা দোস্ত্‌। স্যানাটোরিআম দেখ্‌নেকো আয়ে হ্যায়।"

"অ।" বললেন প্রফেসর ট্যাল্‌পেট্রো। "দেখতে এসে আটকা পড়ে না যান। আমার মতো।"

"সেকি ? আপনি আট্‌কা পড়েছেন নাকি ?"

"আর বলেন কেন ?" বললেন প্রফেসর ট্যাল্‌পেট্রো। "আজ সে ছুতো, কাল সে ছুতো, ডাক্তারবাবু নাছোড়বান্দা। যাক, আপনার সঙ্গে দেখা হল, বড় খুশী হলুম। আমায় হয়তো আগে দেখেননি, আমার নাম—"

আমি বললাম "আপনাকে একদিন দেখেছিলাম সার্কাসে, বছর পাঁচেক আগে, গ্যালারি থেকে।"

"এই দেখুন, এতক্ষণ বলতে হয়।" বলে উঠলেন ট্যাল্‌পেট্রো। "তাই

ভাবছিলুম এত চেনা চেনা লাগছে কেন ?”

গাধাটির কুশল জিজ্ঞাসা করলাম। মনে হলো একটু যেন ব্যথা পেলেন প্রফেসর ট্যাল্‌পেট্রো।

“সে এখন গদিতে বসেছে, চেহারা ভাঁড়িয়ে, ল্যাজ লুকিয়ে, হোম্‌রা চোম্‌রা, মহাদাপট, জয় জয়কার।” বললেন তারপর।

আমি বিস্ময় বিস্ফারিত লোচনে বললাম “কোথায়, কোন্‌ গদিতে ? কি হয়ে বসেছে ? অফিসার, না— ?”

প্রফেসর ট্যাল্‌পেট্রো বললেন “বুঝ সাধু যে জান সন্ধান।” বুঝলাম এর চাইতে আর বেশি ধরাছোঁয়ার ভেতর যাবেন না তিনি।

বললাম “যাই বলুন, ওর ঐ সামনের দু পা ওপরে তুলে দিয়ে পেছনের পা দিয়ে মানুষী কায়দায় হাঁটা একটা দেখবার জিনিস হয়েছিল।”

বিষণ্ণ বদন ট্যাল্‌পেট্রো বললেন “ঐটে শিখিয়েই তো ম্যাসাকার করলুম।”

“গাধাটিকে হাঁটতে শিখিয়েছিলেন আপনি ? আমি ভেবেছিলাম বুঝি—”

“রেবেকা।” বললেন ট্যাল্‌পেট্রো। “সবাই তাই ভাবত, আর ভিড় করে আসত, চাবুক হাতে রেবেকা গ্রেট ডংকি অ্যাক্‌ট্‌ দেখাত বলে। আমি মশাই শুঁকো ট্যাল্‌পেট্রো, তালপাতার সেপাই, অমন ফিগারওয়ালী যুবতী নই, ও ডংকিকে আমি হাঁটালে অ্যাক্‌টো যদি বা হতো, গ্রেট হতো না। আর ঐ রেবেকা, রং যেন কাঁচা সোনা পাকা মর্তমান, যৌবন ফেটে বেরোতে চাইছে আঁটসাঁট সাটিনের সার্কাসী পোশাক থেকে, ওর হুকুমের তাঁবেদার সার্কাসের গাধা হতে প্রাণে সাধ আপনার জেগেছিল কিনা একবার বুকে হাত রেখে বলুন দেখি ?”

“হয় তো হয়েছিল, জানতে পারিনি।” পরশুরামী কায়দায় জবাব দিলাম।

সহসা সচকিত হয়ে উঠলেন প্রফেসর ট্যাল্‌পেট্রো, কিছুক্ষণ

ধরে অবহেলিত, উপেক্ষিত হচ্ছেন শেঠজী। তাই বললেন তাঁর দিকে তাকিয়ে "হাম নেহি জান্‌তা আপ কেয়া কহেগা শেঠজি, লেকিন হামারা সার্কাসকা গাধাঠো হামকো বুকমে বড়া দাগা দে গিয়া। হামারা দুখ হ্যায়, গিয়া তো গিয়া, আগারি থোড়া বোল্‌কে কাঁহে নেহি গিয়া?"

"বেইমান, বেইমান, বিল্‌কুল্‌ বেইমান।" চিন্তাকুল দরদী কণ্ঠে বললেন শেঠ কিষেণলাল ভরদ্বাজ। প্রফেসর ট্যাল্‌পেট্রোর গাধা পালিয়েছে, সেই দুঃখে কেঁদে কেঁদে উঠছে শেঠজীর দরদী মন। মনে হলো গাধাহারা বেদনার স্বাদ তিনিও এক দিন পেয়েছিলেন। বোধ হয় তাঁর কোনো গাধাও এভাবে তাঁর প্রাণে দাগা দিয়ে পালিয়েছিল।

আমিও ট্যাল্‌পেট্রো-হৃদয়ে খানিকটা সান্ত্বনা-বারি সিঞ্চন করবার জন্যে বললাম "আপনি অকারণ দুঃখ পাবেন না প্রফেসর। সরকারী বেসরকারী দপ্তরে অনেক গদী অনেক চেয়ার দেখেছি, অনেক সভায় সম্মেলনে সমিতিতে অনেক বজ্র-বচন শুনেছি, গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি আপনার গাধা-ই একমাত্র গাধা নয় যে পালিয়ে ভোল ফিরিয়েছে। 'চক্রবৎ পরিবর্তন্তে' জানেন তো? এখন গাধাদের দিন পড়েছে, অস্বীকার করলে চলবে কেন?"

"জমানা বদল গিয়া ট্যাল্‌পেট্রোজি।" বললেন শেঠ কিষেণলাল ভরদ্বাজ। "ধনপতিবাবু বোল রহে হ্যাঁয় কি গাধেকা হী আভি দিন হ্যায়। দিস ইজ দি এজ অভ ডংকিজ।"

"হামারা গাধা ক্যায়সে পালায়া উ ভি এক বড়া করুণ কাহিনী হ্যায়। শুন্‌নেসে আপকো দোনো চোখমে জল আ যায়েগা শেঠজি।" বললেন প্রফেসর ট্যাল্‌পেট্রো। "আপ তো হামারা গ্রেট রয়েল বেঙ্গল সার্কাস-কা গ্রেট ডংকি অ্যাক্‌ট্‌ দেখা?"

"হাঁ হাঁ, জরুর জরুর, ট্যাল্‌পেট্রোজী। কম-সে-কম দো দফে তো জরুর দেখা। বহুৎ-হী সুন্দর খেল্‌। অ্যায়সা ঔর কভী নহী দেখা।"

"দেখেগা ভী নেহি, শেঠজি।" মলিন কণ্ঠে বললেন প্রফেসর

ট্যাল্‌পেট্রো। "ঐসা খেল কোই গাধাকো শিখানা কোইকো পিতাকা সাধ্যমে নেই কুলায়গা। আপ ভাবতা হ্যায় হাম আপনা ঢাক আপনা হাতমে পিটাতা? হাঁ, পিটাতা হ্যায়, অম্লান বদনমে হাম স্বীকার করেগা। এ যুগমে আপনা ঢাক আপনি নেহি পিটানেসে কোই নেহি পিটায়গা, শেঠজী।"

"হাঁ হাঁ, বাত তো ঠিক হ্যায়।" শেঠজী বললেন।

আবেগে উত্তেজিত উচ্ছ্বসিত আত্মহারা হয়ে উঠেছিলেন প্রফেসর ট্যাল্‌পেট্রো। বলতে লাগলেন "গ্রেট ডংকি অ্যাক্‌ট্ হাজারো লাখো আদমি দেখা—বাল্‌বাচ্চা মরদ জেনানা। বাহবা ঔর হাত-তালি ভি বহুৎ দিয়া, লেকিন ক আদমি মনমে ভাবা হ্যায় এ খেল্‌ হামারা ক্যায়সা অসাধ্য সাধন হ্যায়? দিনকে বাদ দিন, হপ্তাকে বাদ হপ্তা, মাহিনাকে বাদ মাহিনা, বরষকে বাদ বরষ, খানা নেহি, পিনা নেহি, গোশল নেহি, ঘুমানা নেহি, হাম তামাম শরীরকা খুন পানি করকে হামারা ডংকিকো ডংকি অ্যাক্‌ট্ সিখায়া।"

"ঔর ডংকি জব খেল সীখ্‌কর ওস্তাদ বন গিয়া," বললেন শেঠ কিষেণলাল ভরদ্বাজ, "তব সার্কাসমে খেল দিখানা শুরু কিয়া গ্রেট ডংকি ঔর গ্রেট মিস রেবেকা।"

বছরের পর বছর রক্ত জল করা নেপথ্য সাধনা তাঁর, আর প্রকাশ্য খেলায় বাহবার উচ্ছ্বসিত উল্লাস রূপবতী যৌবনবতী রেবেকার। এজন্য কি দুঃখ বা ঈর্ষা আছে প্রফেসর ট্যাল্‌পেট্রোর চেতন বা অবচেতন মনে? অথবা তাঁর সাধনার ফুল রূপসী রেবেকার রাতুল পাদপদ্মের সার্কাসী নাগ্‌রাই-র তলায় ছড়ানো দেখেই তাঁর আনন্দ?

"রেবেকা! রেবেকা! রেবেকা!" প্লুত স্বরে একটি নাম তিন-বার উচ্চারণ করলেন প্রফেসর ট্যাল্‌পেট্রো। বোঝা গেল না এ তাঁর পুলকোচ্ছ্বাস, না আর্তনাদ। যাই হোক, অতর্কিতে আবেগ প্রকাশ করে ফেলে সার্কাস-সম্রাট ট্যাল্‌পেট্রো বোধকরি একটু

অস্বস্তি বোধ করলেন। সেটা বুঝতে পেরেই শেঠজী "আপ্‌কা সার্কাস বঙ্গালকা, তথা ভারতকা গৌরব হ্যায়, ইয়ে বাত্‌ সচ হ্যায় ট্যাল্‌পেট্রোজি। ঔর মিস্‌ রেবেকা ইত্‌নি বড়ী আর্টিস্ট্‌, ইয়ে ভী তো খুদ আপকা হী বাহাদুরি। গদ্ধা, ঔর রেবেকা, দোনোকো তো খুদ আপনে হী ট্রেনিং দেকর আর্টিস্ট্‌ বনায়া। অভী উও গদ্ধা ভাগ গিয়া, কেঁও কি অ্যায়সা হী লিখা হুয়া থা। তগ্‌দিরকা কলম অ্যায়সা হী জবরদস্ত, ট্যাল্‌পেট্রোজি।" ভবিতব্যের কলম কেউ রোধ করতে পারে না, এই তত্ত্ব উচ্চ ঝংকৃত হিন্দী ভাষায় পরিবেশন করলেন শেঠজী। মনে হল এই তত্ত্বের সত্যতা তিনি উপলব্ধি করেছেন নিজেরই জীবনে।

শেঠজীর কথা শুনে প্রফেসর ট্যাল্‌পেট্রোর দু চোখে ছল ছল ভাব আরো প্রবল হয়ে উঠল। মনে হলো তাঁর বুকের ভেতর ধ্বনিত হয়েই চলেছে একটি মিঠে নাম বার বার: রেবেকা! রেবেকা! রেবেকা! রেবেকা! রেবেকা!

গম্ভীরভাবে ট্যাল্‌পেট্রোর সার্কাসের সর্বশেষ পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করলেন শেঠজী। রেবেকা ছিল 'লায়ন-টেমার', সিংহ-দময়ন্তী—পটল তুলেছে সেই সিংহ, পূর্ণ হয়নি তার স্থান। 'গ্রেট ডংকি অ্যাক্‌ট্‌' দেখাত রেবেকা, সেই ডংকি পালিয়ে গিয়ে কোন দপ্তরে অফিসার হয়ে বসেছে কে জানে? তাকে এখন দেখলে হয়তো সন্দেহ করা যাবে, কিন্তু চিনে প্রমাণ করা যাবে না। এখন করবে কি রেবেকা? শেষে যদি বিরক্ত হয়ে 'দুত্তোর' বলে এক দিন ভেগে যায়?

"নেহি নেহি নেহি নেহি নেহি।" বলে চীৎকার করে প্রায় কেঁদে উঠলেন প্রফেসর ট্যাল্‌পেট্রো। মনে হলো শেঠজীর এই অসতর্ক এবং অনিচ্ছাকৃত নির্মম খোঁচায় প্রফেসরের দু চারখানা হৃদয় তন্ত্রী ছিঁড়ে গেছে যেন।

"নেহি নেহি নেহি নেহি নেহি।" বললেন গ্রেট রয়েল বেঙ্গল সার্কাসের গ্রেট প্রফেসর ট্যাল্‌পেট্রো, শেঠজীর মুখে উচ্চারিত অশুভ ইঙ্গিত সইতে না পেরে। অনেক ছোটদের আর অনেক ছেলেমানুষ বড়দের মনে যেমন আতঙ্ক মেশানো ধারণা থাকে সন্ধ্যাবেলা সাপের নাম মুখে আনলেই সাপ আসে, ভূতের নাম মুখে আনা মানেই ভূতকে ডেকে আনা, ট্যাল্‌পেট্রোর বুঝি তেমনি ভয়, রেবেকার পলায়ন সম্ভাবনার কথা মুখে বা মনে আনলেই সে সম্ভাবনা বাস্তবে পরিণত হবে। সার্কাস-সর্বস্ব ট্যাল্‌পেট্রো রেবেকাহীন সার্কাসের কল্পনামাত্রেই শিউরে উঠলেন। আর্তকণ্ঠে হাহাকার করে উঠলেন "নেহি নেহি নেহি নেহি নেহি।"

অনুশোচনায় লজ্জিত, দুঃখিত, মর্মাহত হয়ে শেঠজী বলে উঠলেন "সিয়ারাম! সিয়ারাম! সিয়ারাম! আপ কেঁও পরেশান হো রহে হ্যায় ট্যাল্‌পেট্রোজি? সার্কাস-কী-রাণী কভী সার্কাসসে ছুট কর যা সক্‌তী হ্যায়? আপ নিশ্চিন্ত রহিয়ে, আপকা ইয়ে দোস্ত্‌ কিষেণলাল যবতক জিন্দা রহেগা তবতক রেবেকা সার্কাসসে কভী নেহি ছুটেগী, এহী হ্যায় সিয়ারামজীকী ইচ্ছা। জয় সিয়ারাম! জয় সিয়ারাম! জয় সিয়ারাম!"

"আপকা মুখমে ফুল চন্দন গিরেগা শেঠজি।" প্রাণে পরম শান্তি এবং ভরসা পেয়ে বললেন প্রফেসর ট্যাল্‌পেট্রো। "লেকিন সার্কাসকা সিংহ মর্‌ গিয়া, ডংকি ভাগ গিয়া, পটল তুল্‌ লিয়া সার্কাস-চেম্পিঅন ফার্ণানডেজ, গঙ্গা পা গিয়া হামারা কেষ্টোধন, আভি এ ভাঙ্গা হাটমে মিস রেবেকা কোন্‌ আকর্ষণমে রহেগা?"

"ইস জমানেমে যো আকর্ষণ সবসে জবরদস্ত হ্যায়। চাঁদিকা আকর্ষণ।" বললেন শেঠ কিষেণলাল। "ইস মহিনেমে সুন্দরীকা তন্‌খা আপ তিন হাজার কর দিজিয়ে। চেক হম দে দেঙ্গে। আজহী ভেজ দিজিয়ে রেবেকাকে পাস। সুন্দর ঢঙ্‌সে এক চিঠ্‌ঠি ভি লিখ্‌

দিজিয়ে।”

“চিঠ্‌ঠি? কেয়া চিঠ্‌ঠি লিখেগা হাম?” বিস্মিত হয়ে বলে উঠল প্রফেসর ট্যাল্‌পেট্রো, যেন অপ্রত্যাশিত অভাবিত ভাবে ধরা পড়া গেছেন শেঠজীর কাছে। “কেয়া লিখেগা হাম রেবেকাকো?”

“দিলকী মিঠি মিঠি বাতেঁ।” বললেন শেঠজী। মনে হলো মিঠি মিঠি হাসির রেখা শেঠজীর মুখে দেখা দিয়েছে যেন। সে হাসি দেখে প্রফেসর ট্যাল্‌পেট্রো আবেগে প্রায় হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন, আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলে উঠলেন “শেঠজি, আপ অন্তর্যামী হ্যায়, হামারা মনকা গোপন বাত আপ পকড় লিয়া।”

এইবার শেঠজীর বিস্মিত হবার পালা। শেঠজী বিস্মিত হলেন। শুধালেন “ম্যায়নে আপকী কৌন সী বাত পকড় লিয়া ট্যাল্‌পেট্রোজি?”

প্রফেসর ট্যাল্‌পেট্রো বললেন “এ আপ ছলনা করতা হ্যায়, শেঠজি। আপ সাচ্চা টের পায়া হ্যায় হাম রেবেকাকা প্রেমমে গির্‌ গিয়া।” বলে আবেগে ঝর্‌ ঝর্‌ করে কেঁদে ফেলে রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে লাগলেন।

“হাঁ শেঠজি। হাম রেবেকাকা প্রেমমে গির গিয়া।” বলতে লাগলেন তারপর ক্রন্দনবাধাগ্রস্ত কণ্ঠে। “আভি যব আপ পুরা টের পা গিয়া তব আউর গোপন কর্‌কে কেয়া হোগা? দিল উন্মুক্ত করনেমে হাম আউর লজ্জা নেহি করেগা।”

হয়তো নিজের অতীত জীবনের কোনো গভীর প্রেমের স্মৃতি মনে পড়ে গেল শেঠজীর। তিনি ক্ষণিকের জন্যে চোখ বুজে ভাবগম্ভীর কণ্ঠে বললেন “প্রেম এক অজীব, পবিত্র ঔর স্বর্গীয় চীজ হ্যায়, ট্যাল্‌পেট্রোজি। ইস্‌মে শরমকী কোঈ বাত নেহি। লেকিন—”

এই কিন্তু-তে এসে থেমে গেলেন শেঠজী, ইতস্তত করতে লাগলেন প্রেমে হাবুডুবু ভক্ষণরত ট্যাল্‌পেট্রোর কানে প্রেম সম্বন্ধে তাঁর

কিন্তু-বচন শোনানো বাঞ্ছনীয় হবে কি না।

"লেকিন কেয়া, শেঠজি?" আকুল কৌতূহলে প্রশ্ন করলেন ট্যাল্‌পেট্রো।

প্রেম-তত্ত্ব সম্বন্ধে ভাষণ দেবার আমন্ত্রণ এসেছে প্রেমজর্জর প্রফেসরের আপন মুখ থেকে। তাহলে আর দ্বিধা কিসের?

শেঠজী বলতে লাগলেন "প্রেম অতি মধুর হ্যায়, প্রেম অতি কঠিন হ্যায়। প্রেমমে অম্রুৎ হ্যায়, প্রেমমে জহর ভী হ্যায়। প্রেমমে হাঁস্‌না হ্যায়, ফির রোনা হ্যায়। প্রেমমে যিতনা পুলক, উতনা হী জ্বালা। প্রেমমে ফস্ যানা এক বড়ে ঝমেলেমে ফস্ যানা। প্রেমকী শীতল সরোবর, প্রেমকী মনোরম ফুলোঁসে ঔর ফলোঁসে ভরা হুয়া বাগিচা, প্রেমকা তারে-চম্‌কীলী 'আস্‌মান, প্রেমকা—"

কিন্তু 'প্রেমকা' আর কি কি আছে তার ফিরিস্তি দিতে পারলেন না শেঠজী, কারণ তার আগেই একেবারে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন প্রফেসর ট্যাল্‌পেট্রো। যাকে বলা যায় ডুক্‌রে কেঁদে ওঠা, কণ্ঠ ছেড়ে কাঁদা। কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠলেন "মর যায়গা, মর যায়গা, হাম বিলকুল মর যায়গা শেঠজি।" বলে বোধকরি মৃত্যু-যন্ত্রণা চাপবার চেষ্টায় দুটি হাতে মেডেল-শোভিত বুক চেপে ধরলেন।

শেঠজী বললেন "মরনা তো এক রোজ জরুর হী হ্যায় ট্যাল্‌পেট্রোজি, মগর ইতনী জল্‌দি কেঁও? আপ, গ্রেট প্রফেসর ট্যাল্‌পেট্রো, বঙ্গালকে এক মহান গৌরব হ্যায়। ঔর কম্‌সেকম বিস পঁচাস সাল জীনা তো আপকা অবশ্যহী উচিত হ্যায়।"

আমিও বললাম 'বাঙ্‌লা আর বাঙালীর মুখ চেয়ে আপনার সত্যিই আরো বিশ পঞ্চাশ বছর বাঁচা উচিত। অন্তত বিশ বছর তো বটেই।"

আমার অস্তিত্ব হয় তো আবেগের জোয়ারে ভুলেই গিয়েছিলেন

ট্যাল্‌পেট্রো। এইবার আমার কথায় খেয়াল হওয়াতেই তিনি নিজেকে একটু সামলে নিয়ে শেঠজীর দিকে তাকিয়ে কিন্তু আমাকেও শুনিয়ে বললেন "হাম বাঙ্গালীকা গৌরব, এ বাত কয়ঠো বাঙ্গালী জানতা? প্ল্যাকার্ড, পোস্টার, সাইনবোর্ড ঔর হ্যাণ্ডবিলমে ঢাক পিটাকে জানানা পড়তা হ্যায়। ঢাক পিটানা খতম তো গৌরব ভী খতম।"

অবাক হয়ে তাকালাম প্রফেসর ট্যাল্‌পেট্রোর মুখের দিকে। একটি কথায় তিনি যেন বিংশ শতাব্দীর অন্তরের একটি জানালা ভেতরের দিকে খুলে দিলেন। ঢাক পিটানা খতম তো গৌরব ভী খতম! হায়রে ঢাক পিটিয়ে অর্জন করা, ঢাক পিটিয়ে বাঁচিয়ে রাখা গৌরব!

"রেবেকাকা প্রেম নেহি পানেসে হাম কলিজা ফাট্‌কে মর যায়গা শেঠজি।" বলতে লাগলেন চোখ মুছতে মুছতে প্রফেসর ট্যাল্‌পেট্রো। "হাম ক্যায়সে কহেগা হামকো কেয়া হো গিয়া? শয়নমে রেবেকা, স্বপনমে রেবেকা, উঠনেমে রেবেকা, বৈঠনেমে রেবেকা, ঘরমে রেবেকা, বাহারমে রেবেকা। শেঠজি, হাম পাগল হো যায়গা।"

শেঠজী ভদ্রতার স্নিগ্ধ হাসি হেসে বললেন "আরে নেহি, নেহি। পাগল কহীঁকা!"

"রেবেকাকা লিয়ে হী হাম ফার্ণানডেজকো হারায়া, হামারা কেষ্টো-ধনকে হারায়া। আভি রেবেকাকো হারানেসে হাম মর যায়গা শেঠজি।"

"আপকে দিল্‌সে রেবেকা কভী নহী ভাগ্‌ যা সকেগী ট্যাল্‌পেট্রোজি। আপ ঘবড়াইয়ে মৎ। আপকী যো কহানী কল্‌ হমকো সুনাতে রহেঁ থেঁ, আভি ধনপতিবাবুকো ভী জরা সুনাইয়ে। আপকী হালৎ ঔর পরিস্থিতিকে সাথ পরিচিত হোকর ধনপতিবাবু ভী কুছ সলা আপকো দে সকেঙ্গে।"

শেঠজীর অনুরোধ রাখতে—হয় তো বা আমার কাছ থেকে কিছু শলাপরামর্শ লাভ করবার লোভেও—আত্মকাহিনী শোনাতে শুরু

করলেন প্রফেসর ট্যাল্‌পেট্রো। সে কাহিনী তাঁরই ভাষায় লিখে রাখছি।……

ছিলেম ভজহরি তলাপাত্র। সার্কাসী ব্যবসার খাতিরে হতে হলো বিলিতি কায়দায় বি ট্যাল্‌পেট্রো। তারপর নামের আগে একটা 'প্রফেসর' লাগিয়ে প্রফেসর ট্যাল্‌পেট্রো। জানেন তো, ভেক না হলে ভিখ মেলে না, আর গেঁয়ো যোগীও ভিখ পায় না?

পয়সা মন্দ কামাইনি আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে, বেঁচে থাক আমার বাঙালীর গৌরব গ্রেট রয়েল বেঙ্গল সার্কাস। অবিশ্যি এখন আর তেমন কামাই হচ্ছে না, বাজার ভারী মন্দা। ছেলে বুড়ো মেয়ে মদ্দা সবাই ফিলিমে ফিলিমে ভূত-পেত্নীর নেত্য দেখছে, সার্কাসের মর্দানা তামাশা তাদের সইবে কেন?

তার ওপর দেখুন দুটো সিংহ পট্‌পট্‌ করে মরে গেল। আবার যে নতুন এনে তাদের ফাঁক ভরাবো তেমন ভরসা পাচ্ছিনে। বাজার মন্দা, সিংহ কেনার টাকাই উশুল হবে না হয়তো।

সিংহ দুটোর কিন্তু অমন সাত তাড়াতাড়ি পটল তোলার কথা নয়, এমন কিছু বয়স হয়নি। আর খাওয়া দাওয়ায় ওদের যা যত্ন আত্তি করতুম, মনিষ্যির অমন যত্ন হয় না। ব্যাটারা নেহাৎ নেমকহারাম, তাই মরে গেল।

অবিশ্যি, ওদেরি বা দোষ কি? ওরা জানোয়ার, জানোয়ারের মতো বেঁচেছে, জানোয়ারের মতই মরে গেল। আমাকে জব্দ করার জন্যেই যে, তা নয়। বিশ্বেস করুন আপনি।

সিংহের খেলা শেষ দেখাতো রেবেকা। দেখেছেন তো রেবেকাকে? আশ্চর্য মেয়েটা। সার্কাসটাকে তো আজকাল ও-ই একরকম—একরকমই বা বলি কেন, পুরোপুরি—বাঁচিয়ে রেখেছে। সিংহ মরে গেছে, তবু রেবেকা আছে, তাই আপনারা মশাই রেবেকাকেই দেখতে আসেন।

দেখবার জিনিস বটে। চোখ পড়লে চোখ ফেরানো শক্ত। হরদম তাই ভয়ে ভয়ে থাকি কোনো ফিল্ম কোম্পানী না ওকে ফুস্‌লে ফাস্‌লে ভাগিয়ে নিয়ে যায়, বা ও-ই নিজে ভেগে না যায়। মেয়েটা গান গাইতে পারে না বটে, কিন্তু গানতো আড়ালের গাইয়ে দিয়ে গাওয়ানো হচ্ছে আজকাল। আসল যেটি দরকার সেটি রেবেকার আছে।

এই রেবেকাকেই নিয়ে তো ফার্ণানডেজের সঙ্গে আমার মনান্তর হয়ে গেল। ও, ফার্ণানডেজের কথা আপনাকে বলিনি বুঝি? ওকে ছোটো করে ডাকতুম ফার্ণান বলে। ও আর রেবেকা এই দুজনেই ছিল আমার সার্কাসের জোড়ামাণিক, যাকে আপনারা বলবেন স্টার আর্টিস্ট্। রেবেকার অনেক খেলা—আসল আসল খেলাগুলোই ফার্ণানের কাছে শেখা। ফার্ণান জাতে ছিলো গোয়ানিজ কিনা জানিনে—আমাদের সার্কাসে জাত বিচারের কোন বালাই নেই, বামুনও যা শুদ্দুরও তাই। ফার্ণান ছিলো সার্কাস খেলোয়াড়দের রাজা। আহা হা, ফার্ণান বেঁচে থাকতে ট্যাল্‌পেট্রোর সার্কাস দেখেননি আপনি! দুনিয়ার সেরা শক্ত শক্ত খেলা দেখাচ্ছে না যেন নস্যি টানছে। এক চুল এদিক ওদিক হয়েছে কি মরেছে, নিঃশ্বেস বন্ধ করে হাঁ হয়ে দেখতো সবাই। খাঁটি কথা বলতে গেলে, ফার্ণানই আমার সার্কাসকে তুলে দিয়ে গেল—ফার্ণান আর রেবেকা।

খেলা দেখাতে আর খেলা শেখাতে সমান ওস্তাদ ছিলো ফার্ণান। ভেতরে মশলা না থাকলে অবিশ্যি মাল বানিয়ে তোলা যায় না—তবু বাহাদুরী আছে ফার্ণানের, একথা একশোবার বলবো। অদ্ভুত শেখালে রেবেকাকে, যেন যাদু। ভূতুড়ে যাদু। আমি ভাবতুম শেখাচ্ছে শেখাক, ভালোই তো। খুশীই হতুম। খেলা দেখাবার জন্যেই যা মাইনে দিতুম ফার্ণানকে, খেলা শেখানোর জন্যে এক আধলাও নয়। ফার্ণান যদি বিনি মাইনেতে রেবেকাকে সব সেরা সেরা খেলা এক এক করে শিখিয়ে পাকা করে দেয় তো মন্দ কি? শেখাচ্ছে, শেখাচ্ছে ফার্ণান রেবেকাকে, আমি

যেন দেখেও দেখছি না।

কিন্তু শেষটায় বাড়াবাড়ি শুরু করলে ফার্ণান। বাড়াবাড়ি যে করবে সে আমার আগেই খেয়াল করা উচিত ছিল, কিন্তু করিনি। আমি আবার—কি জানেন? মাঝে মাঝে এক গবেট মার্কা হয়ে যাই।

ক্রেমে ক্রেমে দেখলুম রেবেকাকে শেখানোর চাইতে ফার্ণানের বেশী নজর রেবেকার ওপর। রেবেকাকে খেলা শেখানো আসলে রেবেকাকে বাগাবার ফন্দি ছাড়া কিছু নয়। দেখতে যাকে বলেন সুপুরুষ, সেটি ছিলো না ফার্ণান, পুরুষ্টু হলে কি হবে? বরং কুপুরুষই বলা যেতো তাকে। আর সেই জন্যেই বোধ করি অমন অদ্ভুত ভালো খেলোয়াড় হতে পেরেছিলো ফার্ণান, একলব্যের মতো সাধনা করে। কেন? না, চেহারা দেখিয়ে সুন্দরীর যে-মন মিলবে না, খেলা দেখিয়ে তাক লাগিয়ে তাই পেতে হবে। রেবেকা সুন্দরীকে দেখে তার মন মজে গেল। কিন্তু শুধু মজলে তো হবে না, মজানোও যে চাই। নিজে খেলোয়াড়নী রেবেকা, শুধু খেলা দেখিয়ে হয়তো তাকে মজানো যাবে না, এই জন্যেই তাকে খেলা শেখাবার রাস্তা ধরলে ফার্ণান।

সার্কাস দলের লোকেদের ভেতর কানাঘুষো শুরু হলো, তার ছুটো চারটে কথা পৌঁছলো এসে আমারো কানে। শুনলুম ফার্ণানের মতলব সে বিয়ে করবে রেবেকাকে। রেবেকা নাকি মাথা নেড়েছে। মাথা নাড়ার মানে অবিশ্যি না-ও হতে পারে, হাঁ-ও হতে পারে, কিন্তু হাঁ-ও যে হতে পারে তাই ভেবে মনটা চট্ করে শিউরে উঠলো। শাস্তোরেই তো বলেছে মশাই মুনিদেরও মতিভ্রম হয়; তাহলে মেয়েদেরই বা হতে বাধা কি? কতো খাসা সুন্দরী মেয়ে ভূতুড়ে চেহারার সঙ্গে প্রেম করে তো আকৃছার পালাচ্ছে। তারপর কি হচ্ছে সে আলাদা কথা। কিন্তু পালানোটা তো আপনি আটকাতে পারছেন না।

ফার্ণান-চরিত্র আমি কিছু কিছু জানতুম। পুরোপুরি নখদর্পণে

ছিলো একথা অবিশ্যি বলতে পারিনে। বাচ্চা ভারী ভালোবাসতো ফার্ণান। এক কালে সেও বাচ্চা ছিল, সেই জন্যে নয়, এককালে বাচ্চা তো আমরা সবাই থাকি, বাচ্চা-পিরিত আর ক'জনের থাকে? কিন্তু বাচ্চা-পাগল বলা যেতো ফার্ণানকে। সার্কাসের অনেক পাশ দিয়েছে অনেক বাচ্চাকে, যাদের সার্কাস দেখবার শখ ছিলো, টিকিটের পয়সা ছিলো না। যে সব দিনে কম্‌প্লিমেণ্টারি পাশ একদম বন্ধ করে দেবার কড়া নোটিশ দিতুম, ফার্ণান সে সব দিনে নিজের গাঁটের পয়সা খরচা করে টিকেট কিনে দিতো অনেক বাচ্চাকে। ভাবলুম রেবেকাকে বিয়ে করলেই ফার্ণান বছর না ঘুরতেই মা বানিয়ে ছাড়বে রেবেকাকে, তারপর বছর বছর। তখন বাচ্চাই সামলাবে, না সার্কাসের খেলাই দেখাবে রেবেকা? আর রেবেকা না থাকলে সার্কাস যে কানা হয়ে যাবে আমার। রেবেকার অভাবের ধাক্কা ফার্ণান সামলে দিতে পারবে না—লোকে তার শিউরে-তোলা তাক-লাগানো খেলা দেখে যতই বাহবা দিক, তাদের মন তবু কাঁদবে রেবেকার জন্যে। সার্কাস-পিয়াসীরা তো শুধু খেলা দেখতেই আসে না, খেলা যে দেখায় তাকে দেখতেও আসে। নইলে, আমার সার্কাসে এককালে ছিলো রুক্‌মা বাঈ—শুধু খেলার দিকে দেখতে গেলে রুক্‌মার কাছে রেবেকা নাবালিকা। কিন্তু রুক্‌মা আসর জমাতে পারেনি, আর রেবেকা নইলে আসর জমে না। এই রেবেকাকেই সার্কাস থেকে সরিয়ে নিতে চায় ফার্ণান্‌ডেজ! আক্কেলটা দেখুন একবার! আরে বাপু, এই যদি তোর মতলব তবে এত করে সার্কাসী শক্ত শক্ত খেলা শিখিয়ে তৈরী করার দরকারটা ছিলো কি? ঘরকন্না করার মেয়ে তো ঘরে ঘরে ফ্যা ফ্যা করছে। আর রেবেকার মত সার্কাসী মেয়ে লাখে একটার বেশী মেলা ভার। কাচ্চা বাচ্চার মা হয়ে ঘরকন্না করবার জন্যে তো আর সার্কাসের খেলা রপ্ত করবার দরকার হয় না।

ভাবলুম রুখে দিতে হবে এই বেলা। নইলে রেবেকার বারোটা বাজিয়ে ফার্ণান আমার সার্কাসের বারোটা বাজাবে। একদিন চুপি চুপি

ডাকলুম ফার্ণানকে। ডেকে এমন ভাব দেখিয়ে গোসা করলুম যেন ফার্ণান যে রেবেকাকে খেলা শেখাচ্ছে তা আমি অ্যাদ্দিন দেখিনি, এইবারে হঠাৎ টের পেয়ে গেছি। বললুম, এভাবে আমাকে না জানিয়ে চুপি চুপি খেলা শেখানো চলবে না।

ফার্ণান চমকে উঠে বললে 'সেকি ওস্তাদ?'

আদব জানতো বটে ফার্ণান। সে আমি মশাই একশোবার বলবো। ছোক্‌রা আমার ওস্তাদের ওস্তাদ হবার লায়েক হয়েও আমায় ওস্তাদ বলতো। কেন? না আমি দলের মালিক, দলের সর্দার।

চমকে উঠলে বলেছি না? হ্যাঁ, চমকেই উঠলে ফার্ণান। প্রাণ ঢেলে খেলা শিখিয়েছে আমার দলের সেরা খেলোয়াড়নীকে, এক আধলা মজুরির দাবী জানায়নি; আশা করেনি তার জন্যে। কোথায় আমি খুশী হয়ে পিঠ চাপড়াবো, বখ্‌শিশ দেবো, তা নয় আমি গোসা করছি। তাজ্জব!

ওর মুখ দেখে মশাই প্রাণটা ঝাঁ করে নরম হয়ে উঠলো। তখখুনি ভাবলুম, না, নরম হলে চলবে না। গরম হতে হবে। নইলে আমার সাজানো সার্কাস শুকিয়ে যাবে।

বললুম 'আমার সার্কাসে আমার হুকুম ছাড়া কিছু চলবে না ফার্ণান।'

ফার্ণান বললে 'বে-খেয়ালে অপরাধ করে ফেলেছি ওস্তাদ, ঘাট মানছি আমি; এবার হুকুম দাও আমার বাকী সবগুলো খেলা আমি রেবেকাকে শিখিয়ে দিই। তুনিয়ার সেরা সার্কাস-খেলোয়াড়নী আমি বানাবো ওকে।'

যে চোখে তাকিয়ে সে সিংহদের কাবু বানিয়ে রাখতো, সেই চোখে তার দেখলুম মেঘলা আকাশের আড়ালে জ্বলছে ভালোবাসার আগুন। রেবেকাকে ভালো বেসেছে ফার্ণান, রেবেকার জন্যে ভালোবাসায় ওর পা থেকে মাথা তক সবগুলো রক্ত টগবগ করে ফুটছে। ঐ ভালোবাসার

গাছে ফুল ফুটলে ফল ধরলে আমার সার্কাসের লোকসানের কথা ভেবে আমারো রক্ত টগবগিয়ে উঠলো রাগে আর ভাবনায়।

আমি বললুম 'অনেক বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে ফার্ণান, আর নয়। খেলা দেখাতে আর খেলা শেখাতে তুমি জানো তা মানি, কিন্তু কাকে কি খেলা শেখানো উচিত সেইটে তুমি জানো না। যে সব শক্ত খেলা পুরুষের শরীরে চলে, তার সবগুলো মেয়েদের শেখানো যদিও বা যায়, তার ফল ভালো হয় না ফার্ণান! তুমি জানো না, রেবেকাও বুঝতে পারছে না, তুমি তার সর্বনাশ করছো। তাই তোমায় হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, তুমি আর কোনো খেলা শেখাবে না রেবেকাকে।'

জানি নে কি ভাবলে ফার্ণান, কিন্তু আমার হুকুম সে মাথা পেতে নিলে। রেবেকার বন্ধ হয়ে গেল নতুন খেলা শেখা। কিন্তু বন্ধ হলো না দেখাশোনা, কথাবার্তা, মেলা-মেশা। অথচ ওটা বন্ধ করা দরকার। এমনিতেই রেবেকার মনের ভেতর ফার্ণান কতটা সেঁধিয়ে বসে আছে কে জানে? সুবিধে পেলে যে আরো জাঁকিয়ে বসবে, আর তারপর যা হবার হবে।

মেয়ে জাতকে তো জানি মশাই, যা বলা যাবে তার উলটোটি করতে চাইবে, পুবে যেতে বললে জেদ ধরবে পশ্চিমে যেতে। রেবেকাকে তাই বললুম না কিছু। ফার্ণানকে একদিন আড়ালে ডেকে বলে দিলুম মেয়ে খেলোয়াড়দের সঙ্গে ও যেন আর আড্ডা না জমায়। একটু ভয় ছিল বটে, ফার্ণান রাগ করে চলে যেতে চাইতে পারে। কিন্তু চাইলেই তো আর হলো না—আমার কাছে আরো তিন বছরের কণ্ট্রাক্টে বাঁধা ফার্ণান, একেবারে নট্ নড়ন চড়ন কণ্ট্রাক্ট। তা ছাড়া জানি তখন ফার্ণান চলে গেলেও আমার সার্কাস টলবে না; এক রেবেকার দামই লাখ টাকা। তার ওপর ফার্ণান সেরা সেরা খেলায় রেবেকাকে পোক্ত করিয়ে দিয়ে রেবেকার দাম দিয়েছে আরো বাড়িয়ে। সার্কাস ছেড়ে ফার্ণান চলে গেলে বরং খুশীই হতুম। মানে, এক হিসেবে খুশী আর কি!

কিন্তু এমনিতে না হয় গুজুর গাজুর ফিসির ফাস্থর বন্ধ করলুম, সার্কাসের প্রোগ্রামে ওদের এক সঙ্গে খেলা তো আর বন্ধ করতে পারিনে! ভাবলুম আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেছে যা হোক। ফার্ণানের সঙ্গে কয়েকটা চমকদার ট্র্যাপিজের খেলা আর হরাইজন্‌ট্যাল্ বারের খেলা ছিল রেবেকার। ঐ খেলাগুলোর জন্যে পাগল হয়ে উঠতো সব সার্কাস দেখিয়ের দল। যেন আমার প্রোগ্রামের আর সব খেলা এদের কাছে ছেলেমানুষ। এদের খেলা কত যে হাততালি আর কত যে এন্‌কোর পেয়েছে, কি আর বলবো আপনাকে?

ওদের জোড়া খেলার সময় চেয়ে দেখতুম রেবেকার দিকে, ভালোবাসার ছাপ পড়ছে কিনা ওর চাউনিতে, ওর হাসিতে, ওর হাবে ভাবে। রকম দেখে গতিক বড়ো স্থবিধে মনে হলো না। ভাবলুম, কথায় বলে মন না মতি, টল্‌তে কতক্ষণ?

মনে মনে ফন্দি আঁটতে লাগলুম। ফার্ণান হয়ে উঠেছে রেবেকার জন্যে পাগল, একেবারে বদ্ধ পাগল, দুনিয়ার তামাম চিকিচ্ছের বাইরে। বিষিয়ে তুলতে হবে রেবেকার মন! যেন রাগে ঘেন্নায় মনে মনে লাথ মেরে ফার্ণানকে দূরে সরিয়ে দেয় রেবেকা, রেবেকার মনে আর কোনদিন যেন ঠাঁই না মেলে ফার্ণানের।

মিলে গেল মওকা। ভগবানই যেন পাঠিয়ে দিলেন। সার্কাসের তাঁবু পড়লো এক রেল ইস্টিশান থেকে খানিক দূরের ময়দানে। ইস্টিশানের কাছাকাছি এক সরাইখানা, খাসা সরাইখানা। খানা যেমন মেলে, পিনাও তেমনি—দিশি, বিলিতি যেমনটি চান। রাত কাটাতে চান, তাও কাটাতে পারেন। পিয়ালা, সাকী, কিছুরি অভাব হবে না। তবে হ্যাঁ, রেস্তো খসানো চাই। দেখে মনটা চট্ করে খুশী হয়ে উঠলো।

দরাজ হাতে রেস্তো হাতে গুঁজে দিয়েই সরাইখানায় পাঠিয়ে দিলুম ফার্ণানকে। বললুম, যাও একটু খানা পিনা করে মন হালকা করে এসো ফার্ণান। এমন সরাইখানা চেখে আর দেখে না এলে পস্তাবে।

গেল ফার্ণান। পড়ে গেল সরাইখানার সাকীর পাল্লায়। নাম কিছু একটা ছিলো নিশ্চয় মেয়েটার ; সবাই ডাকতো সাকী বলে।

ভারী বেলেল্লা বে-আব্রু মেয়ে! দেমাক করে বলতো, ও ভেড়া বানাতে পারবে না যাকে, এমন মরদ আজো জন্মেনি।

আমি চুপি চুপি বলেছিলুম, তা বেশ! আমার সার্কাসের ফার্ণানকে পাঠাচ্ছি। দেখি তাকে কেমন তুমি ভেড়া বানাতে পারো।

ভেড়া বানালে বটে মেয়েটা। ফার্ণানকে বিলকুল ভেড়া বানিয়ে ছাড়লে। রেবেকার সঙ্গে মেলামেশা করবার জন্যে আকুল পিয়াসায় ওদিকে ফার্ণান-কেষ্টোর কল্‌জে ফেটে যাচ্ছে, আর এদিকে আমি মশাই জটিলে কুটিলের মত রেবেকা-রাইকে পাহারা দিচ্ছি।

পাহারা দিচ্ছি ; ওদের পিরিত জমাবার রাস্তা আগলে বসে আছি বললেই হয়।' মানে, আসল কথা, রেবেকাকে আগলে বসে আছি, যেন রেবেকা-চাঁদকে ফার্ণান রাহু গিলে না ফেলতে পারে। ফার্ণান বেচারার বুকের বয়লারে মশাই পিরিতের ইস্‌টীম্ ফেঁপে ফেঁপে উঠছে, কোনো সুন্দরীর পায়ের তলায় সে ইস্‌টীম না ঢালতে পেলে বয়লার যে ফেটে যাবে চৌচির হয়ে। ফার্ণান বেচারা করেই বা কি? সরাইখানার সাকীকে পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলে যেন।

তাই এক এক সময় কি মনে হয় জানেন? আসলে ইচ্ছে করেই ভেড়া বনেছিল ফার্ণান, জেদ করে, গায়ের ঝাল মেটাতেও বলতে পারেন। বলিনে ফার্ণান ছিলো ভীষ্মদেবের ব্যাটা ভীষ্মদেব, বেহ্মচারীর পো বেহ্মচারী। কিন্তু রেবেকাকে আমি অমন আষ্টে পৃষ্ঠে আড়াল করে না রাখলে ঐ সাকীর বাবারও মুরোদে কুলোতো না ফার্ণানকে টলাবার, ভেড়া বানানো তো দূরের কথা।

ফার্ণান বোধকরি একটু চটেছিল, অভিমানও করেছিল রেবেকার ওপর, কেন সে বেঁকে বসেনি, কেন বলেনি আমার মুখের ওপর, 'ফার্ণানের সাথে মেলামেশা আমি করবোই, সে আমার খুশি।' সত্যিই ওকথা

বললে আমি নাচার। রেবেকার হাতের তলায় আমি। রেবেকা রাগ করে সার্কাস ছেড়ে দিলে আমার সার্কাসের দফা গয়া। কিন্তু অমন কথা বলেনি রেবেকা। কি জানেন? এখন ভেবে দেখছি হয়তো রেবেকার মন মজেনি ফার্ণানের ওপর। আসলে আধো আধো পিরিতের ভান করে ভুলিয়ে ভালিয়ে ফার্ণানের ভাঁড়ার থেকে সেরা সেরা খেলাগুলো হাতিয়ে নিচ্ছিল। নইলে পিরিতের আগুন বুকে জ্বললে মেয়েমানুষ কি আর অত সহজে মনের মানুষের সাথে মেলামেশার মানা মেনে নেয়? বিশেষ করে রেবেকার মতো জাঁদরেল স্বাধীন জেনানা? এটা মশাই এখন বুঝছি, তখন বুঝতে পারিনি!

সরাইখানার বেলেল্লা মেয়েটার সঙ্গে ফার্ণানের দহরম মহরমের খবরটা কানাঘুষোয় পৌঁছলো রেবেকার কানে। অবিশ্যি এই পৌঁছবার পেছনে আমারো কারসাজি ছিলো, বোধ করি আঁচ করে নিয়েছেন, চালাক মানুষ আপনি। আমার মতলব ছিলো রেবেকার মনটাকে ফার্ণানের ওপর বিষিয়ে দেওয়া, সে তো বলেইছি আপনাকে।

খুব সম্ভব এই পৌঁছবার পেছনে ফার্ণানের নিজেরও কারসাজি ছিলো। বেহায়া মেয়েটার সঙ্গে বেহায়াপনার বাড়াবাড়িটা ইচ্ছে করেই জাহির করেছিলো ফার্ণান, যেন রেবেকার হিংসে হয় ঐ মেয়েটার ওপর, রেবেকার মনের মানুষকে ছিনিয়ে নিচ্ছে বলে। ভেবেছিলো হিংসে জাগিয়ে রেবেকাকে পুরোপুরি বাগাবে ফার্ণান। রেবেকার আদ্ধেক জেতা মনকে পুরোপুরি জিতবে।

কিন্তু বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে উল্‌টো বুঝলি রাম হয়ে গেলো ফার্ণানের পোড়া বরাতে। সরাইখানার বেলেল্লা মেয়েটার সঙ্গে ফার্ণানের বেলেল্লাপনার খবর শুনে, আর এক দিন নিজের চোখে দেখে—ওকে দেখাবার ব্যবস্থাটা গোপনে অবিশ্যি আমিই কায়দা করে করিয়েছিলুম, নিজে আলগা থেকে—রেবেকা ক্ষেপে আগুন হয়ে বেঁকে বসলো। বললে ফার্ণানের সঙ্গে বন্ধুত্ব তার গেল চিরদিনের

জন্যে খতম হয়ে।

ফার্ণানের কাছে খেলা শেখা তো আগেই বন্ধ হয়েছিলো। এইবার রেবেকা কথা কওয়াও বন্ধ করে দিলে ফার্ণানের সঙ্গে। শুধু তাই নয়, সার্কাসের প্রোগ্রামে ফার্ণানের আর রেবেকার এক সঙ্গে দু' তিনটে খেলা ছিলো। সেই খেলাগুলোও রেবেকা আর দেখাতে রাজী হলো না। মানে, কোনো সম্পর্কই আর রাখবে না ফার্ণানের সঙ্গে। ফার্ণানের যে অবস্থা হলো কহতব্য নয়। ওর অবস্থা দেখলে শেয়াল কুকুরেরও কান্না পেতো। আমার শক্ত চোখেও কেমন একটা ছল ছল ভাব এসে গেল।

কিন্তু রেবেকা তার জেদ থেকে এক চুল নড়লে না। ফার্ণানের সঙ্গে তার যে জুড়ি বেঁধে খেলাগুলো ছিলো, তাদের বদলে সে দেখাতে লাগলো নতুন গুটিকতক একা একা খেলা—সবই অবিশ্যি ফার্ণানের কাছে শেখা। ফার্ণান হয়তো মনে মনে বললে 'বেইমান!' কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারলে না। সরাইখানার সেই বেহায়া মেয়েটার পাল্লায় পড়ে বেহায়াপনা করে রেবেকার কাছে ধরা পড়ে গিয়ে শরমে একেবারে মরমে মরে ছিলো বেচারা।

আসলে রেবেকার ব্যাপারটা কি জানেন? মেয়েটা শুধু একটা অজুহাত খুঁজছিলো ফার্ণানের সঙ্গে আড়ি করে দেবার। ফার্ণানের মতলবটা সে টের পেয়েছিলো মানে ওকে বিয়ে করে বছর বছর মা বানাবার মতলব—আর ও মতলবটা তার পছন্দ হয়নি। দিনকতক একটু ভাব দেখিয়ে কতগুলো সেরা খেলা শিখে নিলে, তারপরই কাজ ফুরোলে পাজী।

ফার্ণান বোধকরি সন্দেহ করেছিলো রেবেকার মন ওর ওপর বিষিয়ে যাবার পেছনে আমার কারসাজি আছে। আমার দিকে ও এমন করে তাকাতে শুরু করলো যেন ফাঁক পেলেই আমাকে সাবাড় করে তারপর নিজে সাবাড় হবে। একটু ভাবনা হলো বই কি! খামকা বেঘোরে পৈতৃক প্রাণটা কে আর হারাতে চায় বলুন? ভেবে দেখলুম সরিয়ে

দিতে হবে ফার্ণানকে, যেমন করে হোক। কেউ কেউ বললে ফার্ণান এবারে আত্মহত্যা করে না বসে।

ক'দিনের ভেতরই সার্কাসে এক সাংঘাতিক কেলেঙ্কারি কাণ্ড। উঁচু ট্রাপিজের খেলা দেখাচ্ছে ফার্ণান। ট্রাপিজের ডাণ্ডার ওপর মাথা রেখে পা দুটো ওপরে চালিয়ে দিয়ে দোল খাচ্ছে, এমন সময় একদিকের দড়ি ছিঁড়ে সঙ্গে সঙ্গে উঁচু থেকে একেবারে নিচে পড়ে গেল ফার্ণান। তাঁবুর তলায় চারিদিকের সার্কাস দেখিয়েরা সবাই শিউরে উঠে চেঁচিয়ে উঠলো। পড়ার মিনিট কয়েকের ভেতরই মারা গেল ফার্ণান—ঘাড় তার ভেঙে গিয়েছিলো। মুখে সে কিছু বলতে পারলো না, কিন্তু চোখ দিয়ে আমায় সে শাসিয়ে গেল। বলে গেল, 'আমার মৃত্যুর জন্যে তুমি দায়ী। এর শোধ আমি নেবো। নেবো। নেবো।'

কবর দেওয়া হলো ফার্ণানকে, একটু ঘটা করেই। রেবেকা দুঃখ একটু পেল বটে, কিন্তু নিশ্চিন্তও হলো বোঝা গেল। ফার্ণান আর কখনো তাকে বিয়ে করবার দাবী জানাবে না।

এর পরের গল্পটুকুই আমায় কাঁদাবার গল্প। ফার্ণানের পটল তোলার পর এক রাত্তিরে সার্কাসের খেলা। ফার্ণান নেই, ফার্ণানের এদিকে খেলা দেখাবার সময় এসে গেছে, পুরোনো রুটিন মতো। রেবেকা তৈরী হচ্ছে খেলা দেখাতে যাবার জন্যে, এমন সময় হঠাৎ দেখি কেষ্টোধন, আমার সবেধন নীলমণি ছেলে, সার্কাসের পোশাক পরে ধাঁ করে গিয়ে ট্রাপিজে চড়ে খেলা দেখাতে শুরু করে দিলে। আমার ভীরু ছেলে কেষ্টো, আমার মা-হারা ছেলে কেষ্টো। নিজে নাগরদোলা চড়া তো দূরের কথা, অন্যকে চড়তে দেখেই যার মাথা ঘোরে। আমার সেই ছেলে অনায়াসে এক ফোঁটা না ঘাবড়ে উঁচু ট্রাপিজের সব চেয়ে শক্ত খেলাগুলো অনায়াসে দেখাতে লাগলো। হাততালি দিয়ে উঠলো সবাই। আশ্চর্য! হুবহু যেন ফার্ণানই এসে আমার ছেলে কেষ্টোর চেহারায় ছদ্মবেশ ধরে খেলা দেখাচ্ছে। ট্রাপিজে দুলতে দুলতে দেখি

হঠাৎ যেন তার মুখে খেলে গেল ফার্ণানের মুখের ছবি।

আমার বুক কেঁপে উঠলো এক অজানা ভয়ে। তবে কি ফার্ণানই এসে কেষ্টোর ওপর ভর করে খেলা দেখাচ্ছে?

খেলা শেষ করে নেমে এলো কেষ্টো। চারিদিকে হাততালি। হাসি-মুখে হাত তুলে নাড়াতে নাড়াতে সার্কাসের সাজঘরে চলে গেল কেষ্টো। তার হাসির কায়দা, হাত নাড়া, চলার ঢং সব কিছুই ফার্ণানের মতো। আমি গেলুম তার পিছু পিছু সাজঘরে। কেষ্টো গিয়ে একটা চৌকির ওপর শুয়ে পড়লো। আমি আস্তে আস্তে গিয়ে গায়ে হাত দিতেই চমকে উঠে বসলে। ওর ভ্যাবাচ্যাকা ভাব দেখে মনে হলো সে যেন কি একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছে।

পরদিন রাত্তিরে ঠিক ফার্ণানের খেলার সময়টাতে আবার ঠিক সেই ব্যাপার। কিছুতেই ধরে রাখা গেল না কেষ্টোধনকে। সে যেন আলাদা মানুষ—কেষ্টোধন নয়। হুবহু ফার্ণানের মতো খেলা দেখাতে লাগলো। রাতের পর রাত এম্নি খেলা দেখায় কেষ্টোধন, কিন্তু খেলা দেখাবার পর তার কিচ্ছু মনে থাকে না। রেবেকার মতো শক্ত মেয়ে পর্যন্ত ঘাবড়ে গিয়ে বললে 'আমি এ ভালো বুঝছি না ওস্তাদ। এ ভূতুড়ে ব্যাপার। রোজা ডেকে বরং ঝাড়াও।'

অনেক খোঁজ করে একজন রোজা পাওয়া গেল, কিন্তু কিছুই করতে পারলে না সে। ফার্ণান শুধু সার্কাস দেখাবার সময়টা কেষ্টোর ওপর ভর করে থাকে, তারপরই চলে যায়। কোনো ক্ষতি করে না—বরং সার্কাসের তাতে লাভই হয়।

আমি ভাবতে লাগলুম 'বেশ তো। এ আর এমন মন্দ কি? সার্কাসের খেলা দেখাবার আশ মেটেনি ফার্ণানের, কেষ্টোর ওপর ভর করে সে তার আশ মেটাচ্ছে। বিনি পয়সায় পাকা খেলোয়াড়ের খেলা পেয়ে আমার তো তাতে লাভই হচ্ছে।'

তারপর মশাই এলো সেই ভয়ঙ্কর রাত, আমার বুক-ভাঙানো রাত।

ট্রাপিজের ডাণ্ডায় মাথা রেখে পা দুটি ওপরে তুলে ট্রাপিজ দুলিয়ে দিলে কেষ্টো। সে এক আশ্চর্য কায়দা। বলে বোঝাতে পারবো না আপনাকে। চোখে দেখলেও বিশ্বাস করা শক্ত। তারপর অদ্ভুত এক ডিগবাজি খেয়ে ট্রাপিজের ডাণ্ডার ওপর দাঁড়িয়ে পড়লো কেষ্টোধন। আমি অবাক হয়ে নিচে দাঁড়িয়ে দেখছি। কেষ্টোধন আমার দিকে তাকিয়ে বিশ্রী রকম হাসলে একবার, ফার্ণানী ভঙ্গীতে। বুঝলুম ওতো কেষ্টোর হাসি নয়। কেষ্টোর মুখ দিয়ে ফার্ণানের হাসি। শয়তানের হাসি, পিলে-চমকানো হাসি।

হঠাৎ এক নিমিষে যেন দমকা হাওয়ায় সেই হাসির দীপ দপ্ করে নিভে গেল। ভয়ে চীৎকার করে উঠলো কেষ্টোধন। অত উঁচু ট্রাপিজে দাঁড়িয়ে একা কেষ্টোধন, রাম ভীতু কেষ্টোধন। তাকে উঁচু গাছের ডগায় তুলে রেখে মই নিয়ে চট্ করে সরে পড়েছে ফার্ণান।

হতভম্ব হয়ে গেছি আমি। কেমন করে বাঁচাবো কেষ্টোকে! কিন্তু বোধকরি সেকেণ্ড দুয়েকের বেশী ভাবতে সময় পাইনি। হাত পা শূন্যে ছড়িয়ে দিয়ে ট্রাপিজ থেকে সোজা নিচে পড়ে গেল কেষ্টোধন—তার গলা থেকে বেরিয়ে এলো একটা আর্তনাদ।

পাগলের মতো ছুটে গেলুম। বোধকরি আধ মিনিটের ভেতর আমাকে নির্বংশ করে চলে গেল কেষ্টোধন। মনে হলো কানের পেছনে ফিসফিস করে কে যেন কি বললে, আর মনে হলো গলার আওয়াজটা ফার্ণানের।

* * * *

প্রফেসর ট্যাল্‌পেট্রোর মুখে গল্প শুনে চলে গেলাম ডাক্তার ত্রিপাঠীর কাছে।

"গ্রেট রয়েল বেঙ্গল সার্কাসে দুটি গাধা ছিল।" বললেন ডাক্তার ত্রিপাঠী। "একটি পালিয়েছে।"

"আরেকটি?"

"আছে। তার নাম ভজহরি তলাপাত্র, ওরফে প্রফেসর ট্যাল্‌পেট্রো।"

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম "সে কি? বাঙালীর গৌরব প্রফেসর ট্যাল্‌পেট্রো, এত বড় একটা সার্কাস গড়ে তুলেছেন—"

"তলাপাত্র তাই বুঝে রেখেছে বটে, রেবেকাও আধা তামাশায় আধা অনুকম্পায় ওকে তাই বুঝিয়েছে বা বুঝতে দিয়েছে।" বললেন ডাক্তার ত্রিপাঠী। "শোনো তাহলে বলি। ভজহরি তলাপাত্র ছিল এক সার্কাস কোম্পানীতে নামমাত্র মাইনের চাকুরে। সেই সার্কাসের সেরা আকর্ষণ ছিল রেবেকা। ওর যেমন রূপ, তেমন যৌবন, তেমনি ফিগার, আর সার্কাসী খেলায় তেমনি অদ্ভুত ওস্তাদি। ভজহরির দুরবস্থা দেখে রেবেকা ওকে ক্লাউনের পদে প্রমোশন দিয়ে মাইনে বাড়িয়ে দেওয়ালে— সার্কাসের মালিক রেবেকার কথায় ওঠে বসে। কিন্তু ক্লাউনগিরি করা তো আর সোজা নয়। আসর জমাতে পারলে না ভজহরি, আর না পেরে চটে গেল মালিকের ওপর। করলে ঝগড়া। মালিক ভজহরিকে অপমান করে বার করে দিলে। মেয়েদের মন বোঝা ভার। ঐ ভজহরির ব্যাপার নিয়েই ঝগড়া করে ঐ সার্কাস কোম্পানী ছেড়ে দিলে রেবেকা। মালিক হাতে পায়ে ধরে কত সাধ্যসাধনা করলে, রেবেকা কিছুতেই মন বদলালে না। রেবেকা-হারা সার্কাস দল বেশী দিন টিকলে না, ভেঙে গেল। মন ভেঙে গেল সার্কাস মালিকের। মরে গেল কিছু দিন পর। কেউ কেউ বললে আত্মহত্যা করেছে। তারপর রেবেকাকে কেন্দ্র করে কতক ঐ ভাঙা সার্কাসের, কতক অন্য সার্কাসের, আর কতক নতুন খেলোয়াড় নিয়ে একটা নতুন সার্কাস দল গড়ে উঠল, অর্থাৎ রেবেকাই গড়ে তুললে। চুম্বকের মতো যেমন আকর্ষণ করতে জানে মেয়েটা, যেমন বিজলীর চমক ওর চোখে আর বিজলী তরঙ্গ অঙ্গে অঙ্গে, তেমনি অদ্ভুত ওর সংগঠনী প্রতিভা। ওর ভেতর এক সঙ্গে চুম্বক, বিদ্যুৎ, আগুন, ঝর্ণা, স্রোত—যাকগে, ওসব ফর্দ দিয়ে

আর কি হবে? নতুন সার্কাস দল গড়ে তুললে রেবেকা, কিন্তু তলাপাত্র-র বেনামে। কেন? না, বেচারা ভজহরিকে একটা কেউকেটা বানিয়ে তুলতে হবে। তলাপাত্র নাম বদলে রেবেকা বানালে ট্যাল্‌পেট্রো, আর তার আগে বসালে প্রফেসর। ভজহরি তলাপাত্র হলো প্রফেসর ট্যাল্‌পেট্রো।"

"এ সবই রেবেকার কাণ্ড?"

"নেপথ্যে থেকে। প্রফেসর ট্যাল্‌পেট্রো সেল্‌ফ্‌-মেড ম্যান নয় ধনপতি, রেবেকা-মেড ম্যান।"

"আশ্চর্য !!!"

"আশ্চর্য কিছুই নয় ধনপতি। আমাদের অনেক সেল্‌ফ্‌-মেড ম্যানেরই নেপথ্য ইতিহাস এই রকম। তারপর আরো শোনো। নানা কায়দায় বিজ্ঞাপনী ঢাক পিটিয়ে প্রচার হতে লাগল প্রফেসর ট্যাল্‌পেট্রো, তথা দি গ্রেট রয়েল বেঙ্গল সার্কাস বাংলার গৌরব।"

বললাম "কিন্তু দি গ্রেট ডংকি অ্যাক্‌ট্‌, সেই অভিনব গাধার খেলাটা?"

ডাক্তার ত্রিপাঠী বললেন "ওর পেছনেও মগজটি রেবেকার, তলাপাত্র-র শুধু গাধার খাটুনিটুকু। টেইক্‌ ইট্‌ ফ্রম মি ধনপতি, রেবেকা এক আশ্চর্য মেয়ে। ওর কথা বেশী ভাবলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। আর ওর কথাই বেশী ভেবেছে ভজহরি।"

হায় প্রফেসর ট্যাল্‌পেট্রো!

বললাম "ট্যাল্‌পেট্রোর কিন্তু বুক-ভরতি অগুনতি মেডেল।"

"সবগুলোই সার্কাস কোম্পানীর খরচে ফরমায়েশ দিয়ে তৈরি আর ফরমায়েশী লোক দিয়ে দেওয়ানো। এর পেছনেও মগজ রেবেকার। তলাপাত্র হয় তো আজও জানে না স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কেউ তাকে মেডেল দেয়নি। ওর মেডেল প্রাপ্তি সব সাজানো ব্যাপার। আর নিজের বিজ্ঞাপনী জয়ঢাকের আওয়াজ শুনতে শুনতে নিজেকে হয় তো

সত্যিই সে বাংলার গৌরব বলে ভাবে।"

হায় প্রফেসর ট্যাল্‌পেট্রো !!

বললাম "প্রফেসর ট্যাল্‌পেট্রোর এখন অহোরাত্র ভাবনা রেবেকা ভেগে না যায় আর গ্রেট রয়েল বেঙ্গল সার্কাস ভেঙে না যায়।"

"ও, তুমি বুঝি জানো না? রেবেকা ভেগে গেছে, সার্কাস দলও ভেঙে গেছে। ঐ যাওয়া সইতে পারেনি তলাপাত্র। সইতে পারেনি বলেই ওকে এই স্যানাটোরিআমে দেখতে পাচ্ছ। ঐ দুটি অপ্রিয় সত্যকেই ও প্রাণপণে মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছে। ফিরে গেলেই ওকে সেই সত্যের সম্মুখীন হতে হবে। তাই ওর সারা অন্তরাত্মা মরিয়া হয়ে আঁকড়ে ধরে রয়েছে এই স্যানাটোরিআমকে। এ জায়গা ছেড়ে যেতে হলে ওর বুক ফেটে যাবে।"

"কিন্তু—"

"জানি, ধনপতি। নিজের মনকে তলাপাত্র অবিরাম এই ধোঁকা দিয়ে চলেছে যে সে চলে যেতে চায়, স্যানাটোরিআম তাকে ছেড়ে দিতে চাইছে না।"

হায় প্রফেসর ট্যাল্‌পেট্রো, রেবেকা-মুগ্ধ ট্যাল্‌পেট্রো !!!

শকুন্তলা স্যানাটোরিআমের পুরোনো অতিথি শান্তনু দস্তিদার তাঁর ঘরের দরজায় সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে রেখেছেন :

শ্রীশান্তনু দস্তিদার,

অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঔপন্যাসিক।

প্রবেশ করলাম ঔপন্যাসিক দস্তিদারের ঘরে। তিনি তাঁর লেখার টেবিলে বসে লিখছিলেন। টেবিলের ওপর প্রচুর কাগজ। ভদ্র-লোকের ডান হাতে ঝর্ণা-কলম, বাঁ হাতে জ্বলন্ত ধূমায়মান বর্মা চুরুট।

বললেন "আসুন ধনপতিবাবু।"

বসলাম ওপাশে গিয়ে অনাবৃত তক্তাপোশের ওপর। বিছানাহীন তক্তাপোশ। লক্ষ্য করে দেখলাম বিছানা চলে গেছে তক্তাপোশের তলায়।

শুধালেম "বিছানার এ অবস্থা কেন? বিছানা ভালো লাগছে না নাকি, শান্তনুবাবু?"

শান্তনুবাবু বললেন "শুনুন তা'হলে আমার উপন্যাসের নতুন অধ্যায়টা।" বলে পড়তে লাগলেন :

"সসীমকুমার সেই পোড়োবাড়ির বৈঠকখানা ঘরে একটি অতি পুরাতন নড়বড়ে তক্তাপোশের উপর চিত হইয়া শুইয়া কড়িকাঠ গুণিতেছিল। তক্তাপোশে অগুনতি ছারপোকা। গায়ে লংক্লথের পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির লংক্লথ ভেদ করিয়া তাহারা সসীমকুমারের রক্ত পান করিতেছিল। সেদিকে সসীমের বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই। সে তখন ভাবিতেছিল—"

"কি ভাবিতেছিল?"

"তাই তো ভেবে মরছি।" বললেন তিনি। "বলুন তো কি ভাবানো যায় সসীমকুমারকে?"

বললাম "আপনার উপন্যাসের নায়ক কি ভাববে তা আমার বাত্‌লে দেওয়া কি ঠিক হবে শান্তনুবাবু?"

শান্তনুবাবু বললেন "তা ছাড়া, আপনাকে তো সসীমের সঙ্গে পরিচয় করিয়েই দেওয়া হয়নি এতক্ষণ পর্যন্ত। সসীম একজন কথা-সাহিত্যিক, লেখে গল্প, লেখে উপন্যাস। বাজারে তার শ্রেষ্ঠ গল্প, স্বনির্বচিত গল্প, নিকৃষ্ট গল্প—আরো নানা রকমের গল্পসংগ্রহ বেরিয়ে হু হু করে কাটছে। তার উপন্যাস বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই কাড়াকাড়ি পড়ে যায় কে কার আগে পড়বে। তার বাড়ির বৈঠকখানায় ঘন ঘন হানা দেয় পাবলিশারের দল, টাকার তোড়া হাতে নিয়ে।"

"কেন ?"

"তার কলমের আরো আরো বই ছাপতে চায় তারা। শেষকালে ক্ষেপে গেল সসীমকুমার। বললে, পুড়িয়ে ফেলব অ্যাদ্দিনের লেখা সব বই। সবগুলি রাবিশ লিখেছি। ওরা আমার ত্যাজ্যপুত্র। এবার লিখব সত্যিকারের ভালো একখানা উপন্যাস।"

"তারপর ?"

"এক ফাঁকে ছদ্মবেশে আর নকল নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে। হ্যাঁ ভালো কথা, সসীমকুমার নামটাই কিন্তু নকল নাম, আর গোঁফ কামানটাই তার ছদ্মবেশ। আগে সে বরাবরই গোঁফ রাখত। বরাবর মানে গোঁফ ওঠার পর থেকে। তাই তার গোঁফ-কামানো চেহারা অনেককেই ধাপ্পা দিলে। শূন্য পকেটে বেরিয়ে পড়ল ভবঘুরে সসীম-কুমার। তারপর পোড়োবাড়ির তক্তাপোশে শুয়ে শুয়ে"—

আমি বললাম "কোথাকার পোড়োবাড়ির তক্তাপোশে ?"

একটু দমে গেলেন শান্তনু দস্তিদার। তারপর বললেন "সেটা এখনো ভেবে দেখিনি।"

"পোড়োবাড়িতে এনে ফেললেন। বেচারা খাবে কি ? ঘুমোবে কোথায় ? তক্তাপোশের ওপরে পাতবার বিছানা আছে কিনা তাও বলেননি।" আমি বললাম মহা চিন্তিতভাবে। "তাছাড়া মশারি ? আপনার ঐ পোড়াবাড়িতে মশা আছে নিশ্চয়ই ?"

শান্তনুবাবু বললেন, "ওখানে মশা রাখা-না-রাখা তো আমার খুশি। তাই তো ভাবছি [illegible] মশার কামড় খাইয়ে সসীমকুমারকে ম্যালেরিয়ায় ভোগাবো কিনা।"

আমি বললাম "সর্বনাশ! ঐ পোড়োবাড়িতে ম্যালেরিয়ায় পড়লে ওকে সেবা-শুশ্রূষা করবে কে? ডাক্তারই বা ডাকবে কে? সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এত জায়গা আর এত বাড়ি থাকতে সসীমকুমার পোড়োবাড়িতে গিয়ে পড়ল কেন? হলোই বা ছদ্মনাম, হলোই বা গোঁফ কামানো।"

শান্তনু দস্তিদার বললেন, "সসীম বেরিয়েছে তার নতুন উপন্যাসের প্লট সংগ্রহ করতে। এবারে সে বাইরের জীবন থেকে প্লট নেবে, মাকড়সার মত শুধু মগজ থেকে নয়।"

বললাম "পোড়োবাড়ি ছাড়া কি প্লট হয় না? বসতবাড়িতে কোনো প্লট নেই?"

শান্তনু দস্তিদার বললেন "বসতবাড়িতে তো আমরা হরদম বাস করছি, কিন্তু পোড়োবাড়ি হরদম চোখে আর দেখি কোথায়? তাই তো পোড়োবাড়িতে এনে ফেললাম সসীমকুমারকে। এই পোড়োবাড়ির নিরালায় একা বসে বসে নতুন উপন্যাসের প্লট পাকিয়ে তুলবে সে।"

"ওকে কি আর কোথাও ঘোরাবেন না?"

"ঘোরাবো বই কি? কিন্তু ওর সব ঘোরার কেন্দ্র হবে ঐ পোড়ো-বাড়ি।" বলে শান্তনু দস্তিদার আমার কানে কানে বললেন "কি আশ্চর্য রূপক, কি অদ্ভুত সিম্বলিজম্, লক্ষ্য করেছেন ধনপতিবাবু? কেন্দ্র হবে ঐ পোড়োবাড়ি। সু[illegible] ইঙ্গিতটা লক্ষ্য করবেন।"

শান্তনু দস্তিদার বললেন "এই সসীমকুমারের কলম দিয়ে আমি যা খুশি লেখাতে পারি। সসীম আমার এই হাতের মুঠোর ভেতর। সাহিত্য-সৃষ্টি-তত্ত্বের একেবারে গোড়ার কথা বলছি, লক্ষ্য করেছেন ধনপতিবাবু?"

"একটা পুরোনো অধ্যায় শুনুন ধনপতিবাবু।" বলে শান্তনু দস্তিদার তাঁর উপন্যাসের প্রথম দিক থেকে শোনাতে লাগলেন :

"বিখ্যাত শিল্পপতি বনোয়ারীলাল হালদার রোগশয্যায় শুইয়া শুইয়া কাতরকণ্ঠে আর্তনাদ করিতেছিলেন। পাশে কেহ নাই। পাশের ঘরে কন্যা ভানুমতী পিয়ানো বাজাইয়া ইংরাজী গান গাহিতেছে, পাশে বসিয়া শুনিতেছে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট তপন রুদ্র, ভানুমতীর ভাবী জীবনসঙ্গী। তপন তন্ময় হইয়া একটি হাভানা সিগার ফুঁকিতেছে। পাশের ঘরে তাহার ভাবী শ্বশুর রোগযাতনায় প্রলাপ বকিতেছে, তাঁহাকে দেখিবার কেহ নাই।"

বললাম "সে কি?"

শান্তনু বললেন "বুড়ো রিটায়ার করে ছেলেমেয়েদের নামে সব কিছু উইল করে দিয়ে ফেলেছে—মানে ওকে দিয়ে আমিই উইল করিয়েছি—এখন বুড়ো গেলেই আপদ যায়। তাই আর ওঁর দিকে কেউ—বুঝলেন না?"

বললাম "তাহলে আর বেচারাকে আটকে রেখে কষ্ট দিচ্ছেন কেন? চট্‌পট মেরে ফেলুন না। লোকটা মরে রেহাই পাক।"

"মেরে ফেললেই তো ভোগ শেষ হয়ে গেল লোকটার। ওকে তিলে তিলে ইঞ্চি ইঞ্চি করে ভোগাবো আমি, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর।" বললেন শান্তনু দস্তিদার : "কলমের বাগে যখন পেয়েছি, সহজে রেহাই দেবো না হারামজাদা হালদারকে।"

তারপর আমার কানে কানে বললেন "বনোয়ারী হালদারের আসলটি হচ্ছে বনমালী চাকলাদার। বড় ভুগিয়েছিল আমাকে। তাই এভাবে উপন্যাসের পাতায় ওর ওপর আক্রোশ মেটাচ্ছি।"

ডাক্তার ত্রিপাঠীর ঘরে ঢুকে দেখি তিনি একা চুপচাপ বসে আছেন।

বললাম "কি ভাবছেন ?"

ডাক্তার ত্রিপাঠী ভাঁজকরা খবরের কাগজটা আমার সামনে ধরে আঙুল দিয়ে একটা খবর দেখালেন। দেখলাম, এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের ফটো ছাপা হয়েছে, তার তলায় খবরে প্রকাশ শ্রীরামপুরের প্রবীণ উকীল মহেশ্বর চৌধুরী সহসা হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন। বোধ হলো এই বৃদ্ধের মৃত্যুসংবাদ পড়েই বিষণ্ণবোধ করছেন ডাক্তার ত্রিপাঠী।

শুধালেম "ইনি আপনার আত্মীয় ? বন্ধু ?"

"কেউ নন।" বললেন ডাক্তার ত্রিপাঠী। বলে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

মনে প্রশ্ন এলো ডাক্তার ত্রিপাঠীর মন বিষণ্ণ হয়েছে কেন ? ঐ অপরিচিত বৃদ্ধ শ্রীরামপুরী উকীলের মৃত্যু-সংবাদ পড়ে কি তাঁর মনে হয়েছে "দিন তো গেল, সন্ধ্যা হলো", লালাবাবুর যেমন "বেলা যায়" শুনে বৈরাগ্য এসেছিল ?

"তোমার কাছে বলতে বাধা নেই, আমি একবার প্রেমে পড়েছিলাম।" বললেন ডাক্তার ত্রিপাঠী। "শুনতে চাও তো বলো, শোনাই।"

"শোনান।"

"তখন আমি বছর পাঁচ ছয় হলো ডাক্তারী পাশ করে বেরিয়ে প্র্যাক্‌টিস্‌ করছি।" বলতে শুরু করলেন ডাক্তার ত্রিপাঠী, "একরকম ভালোই পশার হচ্ছে, হাতযশও খুব। একদিন এক রোগী দেখতে গেলাম। রোগীর বয়স মাঝারির চাইতে কিছু বেশী। আর তাঁর একমাত্র কন্যার বয়সটা তখনকার দিনের হিসেবে কিছু বেশীই—উনিশ। বাপকে যখন দেখতে যেতাম, মেয়ে বাপের কাছে থাকত। আর কি সেবাই করত বাপের! তিন রাত ব্যামোর বড্ড বাড়াবাড়ি ছিল, পাছে রাতে কোনো রকম বিপদ হয় সেই ভয়েই বাড়ির গিন্নীর মিনতিতে

আমায় ঐ তিন রাতই ও-বাড়ীতে থাকতে হয়েছিল। তারপর ক্রাইসিস কেটে গেলে আর রাতে থাকতে হত না, কিন্তু রোজ যাওয়া আসাটা চালু রইল।"

বললাম "তারপর আপনি ঐ উনিশ বছরের মেয়েটির প্রেমে পড়ে গেলেন?"

"ঠিক তাই। মনে হতে লাগল সেও আমার প্রেমে আকণ্ঠ ডুবে গেছে, কিন্তু বুক ফাটলেও তার মুখ ফুটছে না। আমিও যতবার তার কাছে হৃদয়দুয়ার খুলতে গেলাম ততবারই ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলাম। ভীরু হৃদয়ের প্রেম কোনদিনই নিবেদন করা হলো না। তারপর—"

"তারপর?।"

"বিয়ে হয়ে গেল তিলোত্তমার। উনিশ বছরের তিলোত্তমা পরস্ত্রী হয়ে চলে গেল। মনে হলো আমার জীবনটা মরুভূমি হয়ে গেল, এই মরু সাহারার বুকে কখনো আর মরূদ্যান জাগবে না। তুমি কখনো প্রেমে-ট্রেমে পড়েছ ধনপতি?"

"আজ্ঞে না।"

"তা'হলে বুঝতে পারবে না তিলোত্তমাকে চিরতরে হারিয়ে আমার বুকে কি হাহাকার জেগেছিল। সে-হাহাকার তিলোত্তমার বাবার কাছেও শেষ পর্যন্ত গোপন রইল না।"

"কি করে?"

"আগুন বেশীদিন ছাইচাপা থাকে না, হঠাৎ দমকা হাওয়ায় তা প্রকাশ হয়ে পড়ে।"

"আজ্ঞে, তা' যা বলেছেন। শাক দিয়ে বেশীদিন মাছ ঢেকে রাখা যায় না।"

"তিলোত্তমা যে আমার গোটা হৃদয়টাকেই দখল করে বসে আছে সে খবরটা তিনি হঠাৎ একদিন টের পেয়ে গেলেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর বক্ষপঞ্জর ভেদ করে যে আর্তনাদ বেরিয়ে এলো, তা শুনলে তুমি

অশ্রু সংবরণ করতে পারতে না ধনপতি।”

“কি আর্তনাদ?”

“তিনি আর্তনাদ করে বললেন, তিলোত্তমাকে আমার হাতে সম্প্রদান করবারই একান্ত বাসনা তাঁর ছিল, তিলোত্তমারও সেই ইচ্ছাই ছিল, কিন্তু আমার তরফ থেকে সাড়া না-পেয়ে ওঁরা কেউ আমার সামনে হৃদয়দুয়ার উন্মুক্ত করতে ভরসা পাননি। আমি একবার মুখ ফুটে বললেই যাকে চির-জীবনের জন্যে পেতাম, মুখ ফোটাইনি বলে সে চিরদিনের জন্যে আমার পর হয়ে গেল। তার কিছুদিন বাদেই বদলি হয়ে অন্যত্র চলে গেলেন তিলোত্তমার বাবা। তারপর আর দেখা হয়নি আমার সঙ্গে।”

“তিলোত্তমা দেবীকে তারপর কি আপনি ভুলতে পারেন নি, ডাক্তার ত্রিপাঠী?”

“মনে হতে লাগল তাকে কোনোদিন ভুলতে পারব না। অথচ বিবেক বলতে লাগল হাজার হোক, সে যখন পরস্ত্রী হয়ে গেছে তখন আর তাকে মনে রাখা উচিত নয়, যেমন করে হোক তাকে সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়াটাই আমার কর্তব্য। তাই তিলোত্তমাকে ভুলে যাবার জন্যে আমি বিয়ে করে ফেললাম পদ্মলোচনের ভাবী মাকে। আমার ছেলে পদ্মলোচনকে তো তুমি দেখেছো?”

“তার ফটো দেখেছি।”

“তার ভাবী মাকে বিয়ে করে ফেললাম। প্রথম প্রথম বিবেক একটু কামড়াতে লাগল। মনে হতে লাগল তিলোত্তমার প্রতি অবিচার করেছি মৃণালিনীকে বিয়ে করে, আর মৃণালিনীর প্রতি অন্যায় করেছি যে-হৃদয়ে তিলোত্তমাকে ভোলা অসম্ভব, সে-হৃদয়ে মৃণালিনীকেও ডেকে এনে।”

“তারপর?”

“তারপর—কিন্তু তুমি কি বিশ্বাস করবে ধনপতি?”

“করব।”

"যা' বলব তা' আর কাউকে বলবে না ?"

"বলব না।"

"তাহলে শোনো। দু'চার বছরেই একেবারে ভুলে গেলাম আমার প্রথম প্রেম আর তিলোত্তমার কথা। অনেক রোগীর ভিড়ে ভুলে গেলাম তিলোত্তমার বাবাও একদিন আমার রোগী ছিলেন।"

"শুনে বড় বিস্ময় লাগছে, ডাক্তার ত্রিপাঠী। শুনেছিলাম প্রথম প্রেম ভোলা যায় না। অথবা যা ভোলা যায় তা প্রথম প্রেম নয়।"

"দুনিয়ার অনেক সত্য কথাই সোজা করে বললে এমনি বিস্ময় জাগায় ধনপতি। পাছে ভুল ভেঙে যায় এই ভয়ে সত্যকে তাই অনেকে প্রাণপণে এড়িয়ে থাকে। কিন্তু ঐ যে বললে যা ভোলা যায় তা প্রথম প্রেম নয়, ওতে তোমার একটা বড় রকমের সন্দেহ প্রকাশ পেয়েছে। তুমি ভাবছো, আমি তিলোত্তমার প্রেমে পড়িনি। ভুল, ভুল, সে তোমার ভুল, ধনপতি। তার প্রেমে পড়েছিলাম, আকণ্ঠ ডুবেছিলাম তার প্রেমে, এও যেমন সত্য, তারপর তাকে একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম, এও ঠিক তেমনি সত্য। এতে এতটুকু সন্দেহ কোরো না। মাসের পর মাস গেছে, বছরের পর বছর, একবারও মনে হয়নি তিলোত্তমার কথা। এতদিন পর আজ মনে পড়ল আজকের এই কাগজে শ্রীরামপুরের উকীল মহেশ্বর চৌধুরীর মৃত্যু সংবাদ দেখে।"

শিহরিত কণ্ঠে শুধালাম "কে এই মহেশ্বর চৌধুরী, যিনি আপনার আত্মীয় নন, বন্ধু নন, কেউ নন, অথচ যাঁর মৃত্যু-সংবাদ দেখে আপনার মনে পড়ে গেল বহু বছর ভুলে থাকা প্রথম প্রেমের কথা ? তিলোত্তমা দেবী কি এঁরই—"

"সহধর্মিণী।" বললেন ডাক্তার ত্রিলোচন ত্রিপাঠী।

"শোকে সহানুভূতি জানিয়ে একখানা চিঠি লিখে দেবো কি তিলোত্তমা চৌধুরীকে—যাকে বলে কন্‌ডোলেন্‌স্ লেটার ?" শুধালেন ডাক্তার ত্রিলোচন ত্রিপাঠী।

আমি বললাম "ঠিকানা জানবেন কি করে?"

ডাক্তার ত্রিপাঠী বললেন "কেয়ার অব লেট্ মহেশ্বর চৌধুরী, প্লীডার, শ্রীরামপুর লিখলেই চলবে। যাঁর মৃত্যু-সংবাদ খবরের কাগজে খবরের পাতায় অমন ভাবে ছাপা হয় তাঁর বাড়ি ডাকঘরের লোকেরা নিশ্চয়ই চিনবে।"

"অসম্ভব নয়। কিন্তু এতগুলো বছর পরে আপনার নাম কি মনে আছে তিলোত্তমা দেবীর? তিনি যদি ভুলে গিয়ে থাকেন? তা হলে সেই বহু বছর আগেকার কাহিনীটাও চিঠির গোড়ার দিকে লিখে দিতে হয়।"

তিলোত্তমা যে তাঁকে ভুলে গিয়ে থাকতেও পারেন, এ কথা শুনে ডাক্তার ত্রিপাঠী একটু ব্যথিত হলেন বলে মনে হলো।

"আমার খুব সন্দেহ হয় তিলোত্তমা আমার ওপর অভিমান করেছিল, ধনপতি।" বললেন তিনি। "ওর পাণিগ্রহণ করবার অভিলাষ ওর বাবাকে জানাবার গভীর সুযোগ পেয়েও যে জানাইনি, এতে ওর মত অতুলনীয়ার অপমান আর অভিমানবোধ কিছু অস্বাভাবিক নয়। সেই অপরাধে তিলোত্তমার কাছে আমি চিরদিন অপরাধী হয়ে রইলাম আমাকে কখনো ক্ষমা করতে পারেনি তিলোত্তমা।"

"আপনি অকারণ মন খারাপ করছেন ডাক্তার ত্রিপাঠী।"

"অকারণ নয় ধনপতি। কারণটা যে কত গভীর তা তুমি অনুভব করতে পারছ না বলেই এ কথা বলছ। এ কথাটা তাকে জানানো দরকার যে সে আমাকে ভুল বুঝেছিল। মহেশ্বর চৌধুরীর ঘরণী হয়ে সে যখন চিরদিনের জন্যে আমার পর হয়ে গেল, তখন আমার হৃদয় যে নিদারুণ আঘাতে চুরমার হয়ে গিয়েছিল সেইটে কি তাকে একবার জানিয়ে দেওয়া উচিত নয়?"

"সেটা সেই সময় বা তার কাছাকাছি জানিয়ে দিলে যে কাজ হত, অ্যাদ্দিন বাদে তা হবার নয় ডাক্তার ত্রিপাঠী।" বললাম আমি।

"ইংরেজিতে বলে স্ট্রাইক দ্য আয়রণ হোয়াইল ইট্ ইজ হট। লোহা গরম থাকতে থাকতে তার মাথায় ঘা মারতে হয়। অ্যাদ্দিনে লোহা যে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তা ছাড়া—"

"তা ছাড়া আবার কি ধনপতি ?"

"আপনার হৃদয় চুরমারের খবরটা উনি বিশ্বাস করবেন না। যদিও বা করেন, ভাববেন ওটা সাময়িক চুরমার মাত্র, পরে বেমালুম জোড়া লেগে গেছে। কারণ তারপর আপনি বিয়ে করে রীতিমতো ঘর সংসার করেছেন, বাপ ঠাকুর্দা হয়েছেন, সুতরাং এখন—"

"ভুলের পর ভুল করে গেলাম এ জীবনে। এখন আর শোধরাবার সময় কি নেই ধনপতি ?" অসীম ব্যাকুলতা ডাক্তার ত্রিপাঠীর কণ্ঠে।

মনে হলো বুঝেছি তাঁর ব্যাকুলতার উৎস। তাঁর মন কাঁদছে তাঁর আপন বেদনায়, কাঁদছে তিলোত্তমার দুঃখে; বিপত্নীক ত্রিলোচন, পতিহারা তিলোত্তমা; বিরহের হাহাকার হু হু করে কাঁদছে দুজনেরি অন্তরে। অথচ ইতিহাস আজ অন্যরকম হতে পারত, বিরহের বেদনা আজ কাঁদতো না এ দুয়ের হৃদয়ে—শুধু ডাক্তার ত্রিলোচনের একটু ভুলের জন্যেই সব তচনচ হয়ে গেল !

"কিন্তু একটা কথা তুমি ভেবে দেখনি ধনপতি।"

"কি কথা ডাক্তার ?"

চিঠি যদি লিখিই তাকে, তো কি বলে সম্বোধন করব ? তুমি বলে, না আপনি বলে ?" বললেন ডাক্তার ত্রিপাঠী। "তখন যাকে তুমি বলতাম, সেই তাকেই এখন আপনি বলতেও কেমন কেমন লাগবে, অথচ তুমি বলাটাও তেমন সহজ নয়। এই দোটানা এড়াবো কি করে ?"

"ইংরেজিতে চিঠি লিখে। ও ভাষায় আপনি-তুমির বালাই নেই।"

"কিন্তু সেটাও ভালো দেখাবে না ধনপতি। তাই ভাবছি দরকার নেই চিঠি লিখে।"

"আর এ নিয়ে অনর্থক মাথাও ঘামাবেন না, ডাক্তার। জীবনে

কি হতে পারত কিন্তু হলো না, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনো শেষ নেই।” বললাম আমি। “আমি একটা ঘটনা জানি শুনুন। সে ঘটনা আপনার কাহিনীর চাইতেও করুণ। ছেলেটির বাবা মেয়ের বাবার কাছে নগদ পণ দাবী করলেন পাঁচশো টাকা। তার একটি আধলা কমে তিনি রাজী নন। অথচ মেয়ের বাবা পরম গরীব, নামমাত্র পণ দেবারও ক্ষমতা নেই তাঁর, পাঁচশো টাকা তো দূরের কথা। এদিকে ছেলেটি ঐ গরীব বাপের মেয়েটিকে দেখেছে আড়াল থেকে, আর দেখে মুগ্ধও হয়েছে। ওকে না পেলে জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে, এমনি ভাব। অথচ ওর বাপ নাছোড়বান্দা, পাঁচশো টাকা পণের এক আধলা কমে রাজী নন। তখন ছেলেটি এক কাণ্ড করলে।”

“কি কাণ্ড? আত্মহত্যা করে বসল নাকি?”

“না। অনেক দিনে আর অনেক কষ্টে বেচারা সেভিংস ব্যাঙ্কে শ’চারেক টাকা জমিয়েছিল। সব টাকা তুলে ফেললে ব্যাঙ্ক থেকে! আর কিছু টাকা বন্ধুদের কাছে ধার নিয়ে পাঁচশো টাকা পুরো করে চলে গেল গোপনে ঐ মেয়েটির বাবার কাছে। গিয়ে বললে এই নিন পাঁচশো টাকা। এই টাকা পণ দেবেন আমার বাবাকে, কিন্তু সাবধান, এ টাকা আমার কাছ থেকে পেয়েছেন একথা যেন ঘুণাক্ষরেও না প্রকাশ পায়।”

“তারপর? প্রকাশ পেয়ে গেল?”

“বলছি শুনুন। মেয়েটির বাবা কম্পিত হস্তে টাকাগুলো নিলেন ছেলেটির কাছ থেকে। বললেন ‘খুবই অন্যায় হচ্ছে, এ টাকা তোমার কাছ থেকে নিচ্ছি বাবা। নিতান্ত নিরুপায় হয়েই নিচ্ছি। এ টাকা যত শীগ্‌গির পারি তোমায় আমি শোধ দিয়ে দেবো।’ ছেলেটি বললে ‘ছি, ছি, সে কি কথা?’ এর কয়েকদিন পর মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেল।”

“ঐ ছেলেটির সঙ্গে।”

“না। আরেকটি ছেলের সঙ্গে।”

“বলো কি ধনপতি? এ যে রীতিমতো চ্যাচ্‌ড়ামির ব্যাপার হে।

ঐ ছেলেটি—যে পাঁচশো টাকা দিয়েছিল মেয়েটির বাবাকে—কোনোরকম হাঙ্গামা করলে না?'

"পারলে না করতে। ঐ পাঁচশো টাকার লজ্জাতেই পারলে না। একেবারে চুপ করে গেল বেচারা। তারপর ঐ মেয়েটি যখন স্বামীর ঘরে চলে গেল, তখন একদিন গোপনে গিয়ে মেয়েটির বাবাকে শুধালে 'একি করলেন আপনি'?"

"তখন মেয়েটির বাবা কি বললে?"

"তিনি বললেন, যে ছেলেটির সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে হয়েছে তাদের দুজনে ভালোবাসা ছিল। ছেলেটির বাপকে পণ দিতে হয়নি, কারণ ছেলেটির বাপ বেঁচে নেই। পাঁচশো টাকা থেকে বিয়ের খরচায় কিছু গেছে, বাকীটা মেয়ে জামাইকে দিতে হয়েছে নতুন সংসার পেতে বসতে। মেয়েটার মুখ চেয়ে এ বিয়ে দিতে হলো বাবা। আশীর্বাদ করো মেয়ে আমার সুখী হোক। তোমার টাকা আমি শোধ করে দেবো বাবা, কিন্তু তোমার দয়ার কথা এ জীবনে ভুলব না।" বললেন মেয়েটির বাবা। ছেলেটি বললে 'টাকা আমাকে ফেরত দিতে হবে না। আপনার মেয়ে সুখী হোক।' এই বলে চলে এলো ছেলেটি।"

"তারপর"

"ছেলেটি মনের দুঃখে বিয়ে করলে না। প্রার্থনা করলে মেয়েটি সুখী হোক। প্রথম দর্শনেই বোধকরি সে ভালবেসে ফেলেছিল মেয়েটিকে। কিন্তু বিধাতা যেখানে মারেন সেখানে মানুষ কি করতে পারে? সুখী হলো না মেয়েটি। অপদার্থ জানোয়ার স্বামীর হাতে পড়ে দুঃখের সীমা রইল না তার। তারপর এখন সে এক রুগ্ন সন্তান নিয়ে পড়ে আছে বাপের বাড়িতে। স্বামী বেঁচে আছে বটে, আর হয় তো থাকবেও অনেক দিন, কিন্তু স্ত্রীর কোনো খোঁজখবর নেওয়া সে দরকার মনে করে না। তাহলে এখন ভেবে দেখুন সেই ছেলেটির কথা, যার অনেক কষ্টের পাঁচশো টাকাও গেল, তার ওপর জীবনটাও

বরবাদ হয়ে গেল। অথচ মেয়েটাও সুখী হলো না।"

ডাক্তার ত্রিপাঠী একটু ভেবে বললেন "তুমি ঠিকই বলেছ ধনপতি। বিধাতা মাঝে মাঝে বড় যাচ্ছেতাই কাণ্ড করে বসেন। সেন্টিমেন্টের বালাই একদম নেই বিধাতার।"

ডাক্তার ত্রিপাঠীর প্রেমের কাহিনী আমার মুখেই প্রথম শুনলেন শান্তনু দস্তিদার। শুনে বললেন "আমিও প্রেমে পড়েছিলাম। সে কাহিনী শুনলে আপনি অশ্রু সংবরণ করতে পারবেন না ধনপতিবাবু।"

বললাম "শোনান তা'হলে।"

শোনালেন শান্তনু দস্তিদার। বললেন "অনেক বছর আগেকার কথা। তখন আমার বয়স এখনকার চাইতে অনেক কম। ইন্‌জিনিয়ারিং না ডাক্তারী তা ঠিক মনে পড়ছে না, ফাইন্যাল পাশ করে বেরিয়েছি, সামনে সারা ভবিষ্যৎ পড়ে রয়েছে ধূ ধূ ময়দানের মতো। এমন সময় চিঠি এলো চন্দনপুর থেকে, লিখেছে বন্ধু সঞ্জীব। ছুটি নামই আপনাকে পালটে বলছি, আসল নাম অ্যাদ্দিন বাদে আমার মনেও নেই। লিখেছে 'এসো ক'টা দিন থেকে যাও আমাদের সঙ্গে।' গঙ্গার ধারে ওদের চমৎকার বাড়ি, বাড়ির লাগোয়া ওদের পুরুষানুক্রমিক কারখানা। তা'ছাড়া হাঁস, মুরগী, দুগ্ধবতী গাভী, পাঁঠা ইত্যাদির অভাব নেই বাড়িতে। জেলেপাড়াও কাছাকাছি, জেলেরা খাতিরও করে, তাই মাছের মহোৎসব রোজই লেগে আছে। আমি বরাবরই খাইয়ে-মানুষ, তাছাড়া তখন রীতিমতো জিমন্যাস্টিক, কুস্তি, ডন-বৈঠক, যুযুৎসু করা তাগ্‌ড়া শরীর। সাদরে নিমন্ত্রণ মাথায় তুলে নিয়ে চলে গেলাম চন্দনপুর। ছোট্ট অথচ ছিমছাম স্টেশন। ট্রেন থামবার আগেই মুখ বাড়িয়ে দেখি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে বন্ধু সঞ্জীব। বললে 'এসেছিস'? বললাম 'এসেছি'। তারপর গাড়িতে চড়ে রওনা হলাম; যদ্দুর মনে

পড়ে সঞ্জীবেরই গাড়িখানা। অবিশ্যি ভাড়াগাড়িও হতে পারে। অ্যাদ্দিন বাদে মাথার ভেতর সব গুলিয়ে গেছে। বাড়িতে পৌঁছলাম সঞ্জীবদের!···আপনি খুব ফেনানো ফাঁপানো গল্প পছন্দ করেন, না সংক্ষিপ্ত?"

"আসল কথা কিছু বাদ না দিয়ে যতটা সংক্ষেপ করতে পারেন।"

"কোনটা আসল কোনটা নকল সেইটে বোঝা তো সোজা নয় ধনপতিবাবু! তবু আপনি যখন বলছেন, চেষ্টার ত্রুটি করব না। ও-বাড়িতে অন্যান্য চরিত্রদের তাহলে বাদ দিই, বলি শুধু মানসীর কথা। মানসী নামটা আপনার পছন্দ তো?"

"মন্দ কি?"

"তাহলে মনে করুন মানসীকেই সঞ্জীবের বোন করা যাক। এক-মাত্র বোন। চোখ-ধাঁধানো রূপসী নয়, চোখ-জুড়ানো সুন্দরী। অথচ রাঁধতে জানে চমৎকার। ওর তখনকার চেহারা মনে নেই, কিন্তু ওর রান্না করা পাঁঠা, মাছ, মুরগী, হাঁসের স্বাদ আজো যেন জিভে লেগে রয়েছে। আর সবচেয়ে বড় কথা, মানসী যেমন রাঁধিয়ে তেমনি খাইয়ে আধুনিকা অভিজাত রং-চঙে মেয়েদের মতো পেটরোগা নয়। যেমন খাওয়াতে ওস্তাদ, তেমনি খেতে ওস্তাদ। ধীরে ধীরে এমনি সুললিত ভঙ্গিমায় তার খাওয়া, যে দেখবে সেই মুগ্ধ হয়ে ভাববে খাওয়া মানে শুধু চিবোনো আর গেলা নয়, খাওয়াও একটা মহৎ শিল্প-কর্ম, যাকে বলে আর্ট। আপনার জীবনে এ একটা মহা-দুর্ভাগ্য ধনপতিবাবু যে আপনি মানসীর খাওয়া দেখেননি!"

আমার নিদারুণ দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে করুণ হয়ে উঠল শান্তনু দস্তিদারের দু'চোখ।

"ঐ খাওয়া দেখে মুগ্ধ হলাম আমি।" একটু সামলে নিয়ে আবার বলতে লাগলেন তিনি। "খাওয়ার অমন অনির্বচনীয় ভঙ্গী জীবনে আর কখনো দেখিনি। কোথাও যেন ছন্দপতন নেই, কোনো সুর

বেসুর লাগছে না।”

“উনি আপনাদের সঙ্গে বসেই খেতেন বুঝি ?”

“প্রথমে নয়। খাওয়ার ব্যাপারে আড়াল দিয়ে লুকিয়ে যেতে চেয়েছিল মানসী। কিন্তু যখন শুনলাম রান্না ওরই হাতের, তখন আমি বললাম ওকেও আমাদের সঙ্গে বসে খেতে হবে। আমার জেদের সঙ্গে জেদ মেলালে সঞ্জীব। মানসীকে খেতে বসতে হল আমাদেরই সঙ্গে।”

“এক সঙ্গে খেতে বসে বসেই প্রেমের সূত্রপাত হলো ?”

“সে যে কোন মুহূর্তে কেমন করে হলো তা বলতে পারিনে ধনপতিবাবু। হয়তো তখন তা টেরও পাইনি। মাঝে মাঝে নদীর ধারে বেড়াতুম মানসীর সঙ্গে, গোধূলির রঙে রঙিন দেখতুম মানসীকে। সঞ্জীবের ছিল গান লিখে তাতে সুর বসিয়ে মানসীকে শেখাবার বাতিক। তাই যে সময় মেয়েরা গান গাইলে সাধারণত গাইত রবি ঠাকুর বা রজনী সেনের গান, সে সময় মানসী গাইত সঞ্জীবের গান।”

“কেমন ছিল সে গান ?”

“জানি নে ধনপতিবাবু। বলতে পারব না আপনাকে। কারণ মানসী যখন গান গাইত তখন খেয়াল করিনি কি সে গানের বাণী, কি তার সুর—সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠত মানসীর অপরূপ গাওয়া। এ যেন মানসীর রান্নার মতো। মানসীর রান্না যখন খেতাম, তখন মুগ্ধ রসনায় খেয়ালই হত না কি খাচ্ছি—মাছ, হাঁস, পাঁঠা, না মুরগী। আপনার দুর্ভাগ্য ধনপতিবাবু, আপনি মানসীর রান্না খাননি।”

“কিন্তু রান্নার কথা থাক্, গানের কথা বলুন।”

“ঐ যে বলেছি, বলতে পারব না আপনাকে। বলা সম্ভব নয়। হয় তো তার প্রয়োজনও নেই। শুধু আরেকটা কথা বলা আবশ্যক,—মানসী ম্যাট্রিক পাশ করে বাড়িতে আই-এ পড়ছিল। চন্দনপুরের কাছাকাছি মেয়েদের কলেজ ছিল না তখন।”

"তারপর ?"

"একদিনকার কথা বলি। সেদিন নদীতে সাঁতার কাটলাম আমরা তিনজন—আমি, সঞ্জীব আর মানসী। ফিরে এসে আমার সর্দি হলো, সর্দি থেকে জ্বর। বিছানা নিতে হলো।"

"অর্থাৎ শয্যাশায়ী হলেন ?"

"হলাম। কলকাতার সুইমিং ক্লাবে শেখা সাঁতারুর শরীরে নদীর জলে সাঁতারের বাড়াবাড়ি সইল না। ব্যামোর বাড়াবাড়ি হলো। কতদিন আধা বেহুঁশ অবস্থায় কাটল খেয়াল নেই। আশ্চর্য শুশ্রূষা করেছিল মানসী—নইলে আপনার সঙ্গে দেখা হত কিনা বলা যায় না। বেহুঁশ অবস্থার ঘোরে অনেক প্রলাপ বকেছি, জানিনে কি সব কথা বলেছি প্রলাপে। প্রলাপের দমকা হাওয়ায় কি খুলে গিয়েছিল আমার হৃদয়ের রুদ্ধ দুয়ার ? প্রলাপের ঘোরে আমি কি বলেছিলাম জীবনে মানসীকে না পেলে আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে ? তাই শুনে কি দোলা লেগেছিল মানসীর মুগ্ধ হৃদয়ে ? এসব প্রশ্নের নিঃসংশয় জবাব আপনাকে দিতে পারব না ধনপতিবাবু। শুধু এইটুকু বলতে পারি, যখন সেরে উঠে অন্নপথ্য করলাম তখন যেন নতুন আলো দেখতে পেলাম মানসীর চোখে। সঞ্জীবকে বললাম 'ভাই এইবারে ফিরে যাই।' সঞ্জীব বললে 'শরীরটা আরো একটু সুস্থ হোক তারপরে যেও'; মানসীরও এই ইচ্ছা। সুতরাং থাকতে লাগলুম ; আমারও ফিরবার তাড়া ছিল না। এমনি সময় আবির্ভাব হলো বরুণ চৌধুরীর।"

"বরুণ চৌধুরী কে ?"

বরুণ চৌধুরী সঞ্জীবের আরেকটি বন্ধু, তখন মাত্র বিলেত থেকে ফিরেছেন। শান্তনু দস্তিদারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না। তিনি একদিন হঠাৎ এসে অতিথি হলেন সঞ্জীবের বাড়ি।

"কাহিনী অকারণে লম্বা করব না ধনপতিবাবু।" বললেন শান্তনু দস্তিদার। "সংক্ষেপে বলি, বরুণ চৌধুরী এসে পড়াতে সমস্ত স্বপ্ন যেন

তচনচ হয়ে গেল। মনে হতে লাগল, এক জঙ্গলে দুই সিংহের এক সঙ্গে থাকা পোষাবে না। জেলাসি বলুন, দুঃখ বলুন, অভিমান বলুন; যা খুশি বলুন একে। বরুণ বড়লোক, বিলাতফেরত, ব্যাচেলার। পাত্র হিসেবে ওর বাজারদর আমার চাইতে চড়া। আর থাকা উচিত বোধ হলো না। বিদায় নিয়ে চলে এলাম। সেদিন হাজির ছিল না বরুণ চৌধুরী, একদিনের জন্যে কি একটা জরুরি কাজে গিয়েছিল গঙ্গার ওপারে। ওর সেই অনুপস্থিতির ফাঁকে সেইদিনই কেটে পড়লাম। বিদায়-বেলায় মানসী বললে 'আবার আসবেন কথা দিয়ে যান।' আমি বললাম 'আস্‌ব বই কি যথাসময়ে।' মনে মনে বললাম 'যদি নিমন্ত্রণ পাই!' স্টেশনে এসে ট্রেনে তুলে দিয়ে গেল সঞ্জীব।"

"তারপর আবার কবে গেলেন মানসীর কাছে?"

"মানসীর সঙ্গে দেখা হল ষোলো বছর বাদে। তখন তার বয়স পঁইত্রিশ কি ছত্রিশ বছর হবে, ওজনও অনেক।"

"এত বছর বাদে কেন?"

"বিলেত চলে গিয়েছিলাম দুঃখে, অভিমানে, রাগে। যে-ভারতে মানসীকে পেলাম না সে-ভারত আর ভালো লাগল না। বিলেতে, মানে লণ্ডন শহরে চাকরি জুটিয়ে নিয়ে ভুলে থাকতে চাইলাম ভারতকে আর ভারতবাসিনী মানসীকে। ষোলো বছর একটানা বিলেতে কাটিয়ে দিলাম। কিন্তু···কিন্তু···"

"কিন্তু কি শান্তনুবাবু?"

"ভুলতে পারলুম না মানসীকে। ষোলো বছরের চেষ্টা ব্যর্থ হলো।"

"লণ্ডনে কোনো লণ্ডনবাসিনীর প্রেম পাননি, কিম্বা প্রেমে পড়েননি?"

"সাধ ছিল, কিন্তু সাধ্য ছিল না। মনের গভীরে শেকড় গেড়ে বসেছিল মানসী। তাই ষোলো বছর পর ভারতে ফিরে এলাম, যে-বিলেতী কোম্পানীতে চাকরি করতাম তারি কলকাতা অফিসে। এদিককার কোনো খোঁজখবর ইচ্ছা করেই রাখিনি। হঠাৎ এক রবিবার

রওনা হয়ে গেলাম চন্দনপুর। সঞ্জীবের বাড়ি। গিয়ে দেখি অনেক বদলে গেছে বাড়ির চেহারা—তবু নির্ভুলভাবে চেনা যাচ্ছে সেই সনাতন সিংহদ্বার দেখে। সিংহদ্বারের বাইরে সাদা পাথরে কালো হরফে লেখা নন্দন-কানন। বাড়িটির ঐ বাড়ি-অনুচিত নামটি দিয়ে গিয়েছিলেন সঞ্জীবের বাবা। সঞ্জীব তাতে আপত্তি করেনি। দীর্ঘ ষোলো বছর পর নন্দন কাননে প্রবেশ করে ডাকলাম সঞ্জীবকে। ভাবলাম, এতদিন পরে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে আমায় দেখে উল্লসিত হয়ে উঠবে সঞ্জীব। কিন্তু সঞ্জীবের সাড়া পেলাম না।"

সঞ্জীব ছিল না বাড়িতে। বেরিয়ে এলেন একটি পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর বয়সের মহিলা। তিনি শান্তনু দস্তিদারকে দেখে প্রথমটা থমকে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন "আসুন।"

ঘরের ভেতরে ঢুকে প্রদত্ত আসনে বসে শান্তনু বললেন "সঞ্জীব কোথায়?"

মহিলা বললেন "দাদা স্বর্গে চলে গেছেন আজ আট বছর হলো।"

দাদা??? চমকে উঠলেন শান্তনু দস্তিদার। "তবে কি তুমি মানসী?"

"আমি মানসী। আপনি কি আমায় চিনতে পারেননি?"

"তুমি অনেক বদলে গেছ মানসী।"

"আপনি কিন্তু ঠিক তেমনি আছেন।" বলে রহস্য মাখানো হাসি হাসল মানসী। "তবু ভালো এখন চিনতে পেরেছেন।"

বৈধব্যের বেশ পরিহিতা নয় মানসী। সাধব্যের চিহ্নও নেই কপালে বা সিঁথিতে।

"আট বছর হলো সঞ্জীব চলে গেছে? তুমি তা'হলে—"

"একা। কারখানা বিক্রী করে সে টাকা নিরালাশ্রম হাসপাতাল ফাণ্ডে দিয়ে দিয়েছি। আমি এখানকার মেয়ে স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করছি।"

কাহিনী এই পর্যন্ত শুনিয়ে থেমে গেলেন শান্তনু দস্তিদার। দুটি চোখ রুমাল দিয়ে মুছে নিলেন একবার। বুঝলাম, এ কাহিনী বলবার সময় তিনি অশ্রু সংবরণ করতে পারেন না।

বললাম "তারপর ?"

তারপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে শান্তনু দস্তিদার শুধালেন মানসীকে "বরুণ চৌধুরী কোথায় ?"

মানসী বললে "জামাইবাবু এখন আছেন দক্ষিণ ভারতে।"

"জামাইবাবু !!···?!!···"

"হ্যাঁ। আমার মাসতুতো দিদির স্বামী। বরুণবাবুকে আপনি দেখেছেন, আমার সেই দিদিকে দেখেননি।"

সেদিন মানসীর আতিথ্য গ্রহণ করলেন শান্তনু দস্তিদার। বাড়িতে স্নানের গরম জলের ব্যবস্থা করে দিল মানসী। ষোলো বছর আগে নদীতে স্নানের ফল কি হয়েছিল মানসী তা এখনো ভুলে যায়নি।

নিজের হাতে সেই দীর্ঘ ষোলো বছর আগেকার মত রান্না করে খাওয়ালো মানসী। সেই আশ্চর্য, অতুলনীয়, অনির্বচনীয় রান্না। কিন্তু কিছুতে খেল না একসঙ্গে বসে। বহু সাধ্যসাধনা করেও তাকে রাজী করানো গেল না।

দুপুরের খাওয়ার পর বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিয়ে মানসী বলল "বিকেলে চা খাওয়ার পর পাঁচটার গাড়িতে ফেরত রওনা হতে পারবেন।" বলে ভেতরে চলে গেল মানসী।

বিকেলে চা খেতে খেতে শান্তনু দস্তিদার বললেন, "আমার একটা কথা শুনবে মানসী ?"

"বলুন।"

"ষোলো বছর আগে ভুল বুঝে চলে গিয়েছিলুম। আজ যদি সে ভুল ভাঙল, সে ভুল কি আর শোধরানো যায় না ?"

মানসীর চোখ দুটি যেন একবার দপ করে জলে উঠল। মানসী

বলল "যেদিন আপনি চলে গিয়েছিলেন সেদিন মন আমার কেঁদে আকুল হয়েছিল। আশা করেছিলাম আপনি আবার আসবেন, আমাকে দাবি করবেন প্রেমের দাবিতে। খবর না দিয়ে বিলেত চলে গেলেন, কিন্তু খবর তবু পেলাম। দাদা হয়তো চিঠি লিখতেন আপনাকে; আমিই লিখতে দিইনি। আপনার চোখে যে-আলো দেখেছিলাম তাকে ভুল বুঝে আমি আপনার ওপর নির্ভর করে রইলাম। অনেক প্রেম প্রত্যাখ্যান করলাম অনায়াসে, শুধু এই অন্ধ আশায় যে আপনি আসবেন আমায় গ্রহণ করতে। কিন্তু এলেন না আপনি। বছরের পর বছর চলে গেল মরুভূমির ওপর দিয়ে। শেষ হয়ে গেল জীবনের বসন্ত ঋতু।..."

মানসীকে থামিয়ে দিলেন শান্তনু দস্তিদার, আর সইতে না পেরে।

বললেন "আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আমিও করেছি এই দীর্ঘ ষোলো বছর ধরে। তোমার আমার দুজনের শূন্য জীবন এসো আমরা পূর্ণ করি মানসী।"

অর্থাৎ সোজা ভাষায় এতদিন পরে মানসীকে জীবনসঙ্গিনী রূপে প্রার্থনা করলেন শান্তনু দস্তিদার।

"কিন্তু মানসী রাজী হল না।" বললেন শান্তনু দস্তিদার।— "মানসীর আপন হাতে তৈরি চায়ের সঙ্গে ফুলকো লুচি আর ফুলকপির তরকারী খেয়ে বিদায় নিতে হল। তার বছর কয়েকের ভেতর পরলোকে রওনা হয়ে গেল মানসী।"

বলে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন শান্তনু দস্তিদার। আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম "ও নিয়ে মন খারাপ করবেন না শান্তনুবাবু। যিনি যখন যাবার তিনি তখন চলেই যান, এ কেউ রোধ করতে পারে না।"

বলে পাছে ওঁর কাহিনী শুনে অশ্রু সংবরণ করতে পারলে উনি মনে দুঃখ পান, সেই ভয়ে আমিও পরম উচ্ছ্বাসের ভান করে রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে শুরু করলাম।

পরে শোনালাম এ-কাহিনী ডাক্তার ত্রিলোচন ত্রিপাঠিকে। ডাক্তার ত্রিপাঠী বললেন 'বোগাস, বোগাস, একেবারে বোগাস। এ শুধু ধাপ্পা দিয়ে বাহাদুরি নেবার কমপ্লেক্‌স্।"

* * *

শকুন্তলা স্যানাটোরিআমের নৈঋত কোণে ইউক্যালিপ্‌টাস গাছের তলায় একটি তাঁবুতে থাকেন ভোম্বল গাঙ্গুলী—ইনি গুলন্দাজ গোকুল গাঙ্গুলীর ভূতপূর্ব মেজদা নামে পরিচিত, কারণ গোকুল গাঙ্গুলী বছর তিনেক হলো ভূত হয়েছেন। তাঁবুর বাইরে বড় বড় দুই হরফে একটি সংখ্যা লেখা আছে : ১৩।

ভোম্বল গাঙ্গুলীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম ডাক্তার ত্রিপাঠীর সঙ্গে। "দেখুন তো এ কিনা।" আমাকে দেখিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলেন ডাক্তার ত্রিপাঠী।

আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ভোম্বল গাঙ্গুলী হতাশভাবে মাথা নেড়ে বললেন "না, ইনি নন।"

শুধালাম "আমি কে নই ?"

"তেরো নম্বর পাঁঠা।" বললেন ভোম্বল গাঙ্গুলী।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম "তার মানে ?"

"একে আপনার কাহিনীটি বলুন ভোম্বলবাবু।" বললেন ডাক্তার ত্রিপাঠী।

"শুনুন তাহলে বলি।" বলে কাহিনী শুরু করলেন গুলন্দাজ ৺গোকুল গাঙ্গুলীর মেজদা ভোম্বল গাঙ্গুলী।............

নন্দনপুর ইস্টিশান থেকে বাঁকা রাস্তা চলে গেছে পুব মুখো, তারই পাশে 'জনার্দনের সরাইখানা'। সাইনবোর্ডের দরকার হয় না, ঐ নাম সবাই জানে। ইস্টিশান থেকে মিনিটখানেকের পথ, খুব কাছেও নয়, খুব দূরেও নয়। ইচ্ছে করে আর বেশ ভেবে চিন্তেই সরাইখানার

জন্যে এই জায়গা বেছে নিয়েছিলো জনার্দন বাড়ৈ। এখান থেকে ইস্টিশান পরিষ্কার দেখা যায়; দেখা যায় রেলগাড়ির যাওয়া-আসা, আর শোনা যায় আওয়াজ, অথচ ইঞ্জিনের ধোঁয়ার ছোঁয়া লাগে না গায়ে নাকে চোখে, লাইনের ওপর সারি সারি চাকার ঝিক্ ঝিক্ কানে ভালোই লাগে এই দূর থেকে। এখানে বসে খানাপিনা করতে করতে গাড়ি এসে পড়লেও সহজেই ছুটে গিয়ে ধরা যায়—ইস্টিশানে—আগে টিকিট করা থাকলে আরো সহজে

সরাইখানার মাথার ওপরে ছড়ানো বহু পুরোনো বটগাছ। হয়তো এরই আশ্রয়ের লোভে এই জায়গায়টায় সরাইখানার প্রতিষ্ঠা করেছিলো জনার্দন, ওরফে জনাই। সন্ধ্যার পর থেকে আবহাওয়াটা একটু একটু করে গম্ভীর হতে থাকে। হবেই। মাথার ওপর অগুনতি পাতার ছাতা দিয়ে আকাশকে আড়াল করে রেখেছে বিরাট বটগাছ, তার তলায় সন্ধ্যায় রাতে অন্ধকারের পোয়া বারো। বিশেষ করে জনাই জোরালো আলো জোগায় না সরাইখানায়। আলোর বাজে খরচ তার পছন্দ নয়; বলে, 'অন্ধকার দূর করাটাই দরকার, চোখ ধাঁধাবার দরকারটা কি?'

জনাইর সরাইখানায় 'ভিতরে মা-জননীদের বসিয়া খাইবার ব্যবস্থা আছে'; কিন্তু মা-জননীদের এ সুযোগ নিতে দেখা যায় না, সরাইখানায় বাবা জনকদেরই একচেটিয়া আড্ডা। আর আড্ডা প্যাঁচা ও বাদুড়ের, বটগাছের ঘন পাতার জঙ্গলে। প্যাঁচারা দিনের বেলা চুপ মেরে থাকে, আর সারা রাত যখন তখন গুরু গম্ভীর হাঁক ছাড়ে, শুনে কোনো কোনো খদ্দেরের পিলে চমকায়। সে চমকানি টের পেলে ভয়-ভাঙানো হাসি হেসে জনার্দন (ওরফে জনাই) বলে 'ও কিছু নয়, লক্ষ্মী প্যাঁচা। আমার সরাইখানার লক্ষ্মী। এ ডাক যে কানে শুনবে তারি মঙ্গল হবে।'

জনাইয়ের সরাইখানার যেমন নামডাক, তেমনি খদ্দেরের ভিড়।

তার কারণও আছে। এখানকার পরোটা, কাট্‌লেট্‌, চপ খেতে খাসা, খাওয়াতেও খাসা। মাছ, মাংস, ডিম, নিরামিষ—সব রকম খানাই জনাইয়ের সরাইখানায় একবার খেলে আবার খেতে ইচ্ছে করে। দাম একটু বেশীই নেয় জনাই, তবু তা নিয়ে মাথা ঘামায় না কোনো খদ্দের, কেন না কাছাকাছি আর কোনো সরাইখানা নেই, আর জনাইয়ের মুখের প্রত্যেকটি কথা যেন মধুতে ডোবানো, রসে ভরপুর। রসের কথা শোনাবার জন্যে আলাদা পয়সা নেয় না জনাই, ওটা ফাউ।

সরাইখানার দোচালার বাইরে খোলা জায়গায় বটগাছের তলায় খান কয়েক লম্বা বেঞ্চি দাঁড়িয়ে আছে, তারাই খদ্দের মহোদয়গণের বসবার আসন।

যে রাতের কথা বলছি সে রাতের তারিখটা ছিলো জনার্দনের সরাইখানার ইতিহাসে একটা বিশেষ তারিখ।

সরাইখানার সামনে একটা বড় চৌকো পিজবোর্ডের ওপর সাদা কাগজ সাঁটা, তার ওপর মোটা মোটা বড় বড় হরফে লেখা—

স্ুবর্ণ সংবাদ! স্ুবর্ণ সংবাদ! স্ুবর্ণ সংবাদ!

জনার্দন সড়াইখানার ১৩নং জন্ম-বাৎসরীক।

অদ্দ এই উপলখ্যে প্রোত্যেক আট আনার (কম পখ্যে) খড়িদ্দার মহোদয়গণকে এক বাটী কচি পাঁঠার ঘুগনী বীনামুল্যে দেওয়া হইবে। জাহারা পাঁটা খান না, তাহারা উহার বদলে গাছ-পাঁটার ডালনা পাইবেন।

ইহা ভিন্ন প্রোত্যেক মা-জননী খড়িদ্দারকে ছগাছি কাচের চুড়ি উপহার দেওয়া হইবে।

ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি।

আমি আড়ালে জনার্দনকে বলেছিলুম 'এ তুমি কি করেছো জনার্দন?

এ রাজসূয় যজ্ঞ সামলাবে কি করে ?'

বিনীত কণ্ঠে হাত বুলিয়ে জনার্দন বলেছিল 'আপনাদের আশীর্বাদ থাকলে প্রভু, জনার্দন সামলাতে না পারে কি? এ তো একটা তুচ্ছ ব্যাপার।'

বাইরের সবগুলো বেঞ্চিতেই খদ্দেরের ভিড়, কোনরকমে জায়গা করে একটা বেঞ্চের কিনারায় দেহ রেখে বসলুম। বসে বললুম 'হাফ কাপ চা দেখি হে জনার্দন।' এ আমার বরাবরের নিয়ম। আধ পেয়ালা চা দেখতে চাই, জনার্দন পুরো এক পেয়ালা চা খাওয়ায়। দাম সাধাসাধি করি, নেয় না জনার্দন। পয়সাটা ফেরত দিই পকেটে। তরল ছাড়া বাইরে কোথাও কিছু খাইনে, এও জানে জনার্দন।

চা খাচ্ছি আর খদ্দের মহোদয়গণের খানাপিনা দেখছি। রাত তখন সাড়ে ন'টা, ওদিকে মহাকালীর মন্দিরে ঢাকের দু'একটা পাতলা আওয়াজ পাওয়া গেল। আওয়াজ ঠিক নয়, আওয়াজের মহড়া। বারুইপুরের মহাকালীর মন্দির ডাকসাইটে; আর কি অদ্ভুত যোগাযোগ, আজ জনার্দনের সরাইখানার জন্মবার্ষিকীর রাতেই এই মন্দিরেরও প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী! রাত দশটার লগ্নে মহাকালীর বিশেষ পূজো, তখন কড়া করে বাজবে একগাদা ঢাক। এই পূজো উপলক্ষ্যে লোকের ভিড় হয় বারুইপুরে; মা কালীর অনেক ভক্ত রেলে চড়ে আসে নানা জায়গা থেকে।

আট আনার খদ্দেরদের এক বাটি করে পাঁঠার ঘুগনি বা গাছ-পাঁঠার ডালনা দেওয়ালো জনার্দন। গাছের তলায় বসে যে নাপিতরা দাঁড়ি গোঁফ কামিয়ে দেয়, তাদের সঙ্গে অ্যালুমিনিয়মের ছোট্ট বাটি থাকে, তেমনি ছোট বাটি। কিন্তু বাটি, তা তো অস্বীকার করবার উপায় নেই! কোনো মা-জননীর টিকিটিও দেখা গেল না; কাঁচের চুড়িগুলোর কি ব্যবস্থা হলো জানি নে।

ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়লো ইস্টিশানে, ট্রেন এলো কিছুক্ষণ বাদে। তারো কিছুক্ষণ বাদে কিছু কিছু লোক দেখা গেল ইস্টিশান থেকে এইদিকেই আসছে। জনার্দন বললে এদের বেশীর ভাগ আসছে মহাকালীর মন্দিরে পূজো দেখতে। এ নাকি সত্যিই দেখবার মতো পূজো—অবশ্য তাদেরই কাছে, যারা বলি-টলি পছন্দ করেন।

একটি খদ্দের মহোদয় বললেন 'তার মানে?'

জনার্দন বললে 'মা মহাকালীর সামনে আজ তেরোটা পাঁঠা বলি হবে। সে এক দেখবার জিনিস।'

'তেরোটা ?...??...???...????...' কে যেন প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো 'তেরোটা? ঠিক তেরোটা?' চেয়ে দেখি বটগাছের গুড়ির কাছে একটা ছোট টুলের ওপর আধা অন্ধকারে বসে আছেন এক নতুন চেহারার ভদ্রলোক। তিনিই যেন পরম বিস্ময়ের চরম ধাক্কা খেয়ে হঠাৎ গরম হয়ে উঠছেন।

জনার্দন বললে 'হ্যাঁ, একটি একটি করে তেরোটা পাঁঠা আজ বলি হবে। ঘ্যাঁচাঘ্যাঁচ মুণ্ডু নেমে যাবে ধড় থেকে খাঁড়ার ঘায়ে। বলি দেবে করালীকিশোর, গেল পূজোয় নিখিল চব্বিশ পরগণা পাঁঠা বলির পাল্লায় যে পয়লা হয়ে কাপ পেয়েছিলো।'

শুনে সেই নতুন চেহারার লোকটির যেন কেমন একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা গেল। কি পরিবর্তন সেটা বর্ণনা করে বোঝানো অসম্ভব।

একজন শুধালে 'কিন্তু তেরোটা পাঁঠা কেন? তার কম বা বেশী কেন নয়?'

জনার্দন হেসে বললে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। কে যেন এক নাম-না-জানা ভদ্রলোক লোক দিয়ে এই তেরোটা পাঁঠা পাঠিয়েছেন মহাকালীর মন্দিরে আজই রাতে বলি দেবার জন্যে। তাঁর নাকি বিশেষ একটা মানত আছে। মন্দিরের মহান্ত পাঁঠাগুলি গ্রহণ

করেছেন। এরই মধ্যে তবলার দোকানদাররাও ছুটে এসেছে বলি হয়ে গেলে ছাল নিয়ে যাবে বলে। পাঁঠার চামড়া দিয়েই তবলা ছাওয়া হয়।'

একজন খদ্দের কচি পাঁঠার ঘুগনি একটু একটু করে চাখ্‌তে চাখ্‌তে শুধালেন 'কে এই ভদ্রলোকটি, যিনি বলির জন্যে পাঁঠা পাঠিয়েছেন?'

জনার্দন বললে 'তাঁর নাম ধাম তিনি জানাতে চাননি, জানাও যায়নি। পাঁঠাগুলি যে নিয়ে এসেছিলো সে লোক পাঁঠা তেরোটা ডেলিভারি দিয়েই কেটে পড়েছে। সেই পাঁঠাদেরই আজ রাত দশটায় কাটা হবে। সেই মানতওয়ালা ভদ্রলোকও হয়তো লুকিয়ে লুকিয়ে বলি দেখতে আসবেন। আপন মানতের বলি আপন চোখে দেখবেন না এ আমি ভাবতে পারিনে।'

একজন ইংরিজী পড়ুয়া খদ্দের বললেন 'থারটিন ইজ এ টেরিবলি আন্‌লাকি নাম্বার।' তারপর আমাদের ওপর চোখের চাউনি বুলিয়ে বাংলা তর্জমা করে বললেন 'তেরো হচ্ছে একটি ভয়ানক অপয়া সংখ্যা। একেবারে বাইবেলের যুগ থেকে। যীশুর তেরো নম্বর সঙ্গী জুডাস যীশুকে ধরিয়ে দিয়ে ক্রুশে চাড়িয়েছিলো।'

আরেকজন বললে 'খুনে আসামীকে যে দড়ি দিয়ে ফাঁসিতে ঝোলানো হয় তাতে তেরোটা গেরো দেওয়া থাকে। মা কালী বলে ঝুলে পড়বার পাটাতনে উঠতে হয় তেরোটা সিঁড়ি পেরিয়ে। আসামীর পায়ের তলা থেকে তক্তা সরে যায় গলায় দড়ি পরে দাঁড়াবার তেরো সেকেণ্ড পরে। তাছাড়া .....'

সেই নতুন চেহারার ভদ্রলোকটি বললেন অদ্ভুত কণ্ঠে 'অদ্ভুত। অদ্ভুত! অদ্ভুত! সেই তেরো বছরে দেখা তেরো স্বপ্নের কাহিনীর সঙ্গে এ যে হুবহু মিলে যাচ্ছে!' সঙ্গে সঙ্গে ওপরে একটা প্যাঁচার ডাক!!!

তেরো বছরে দেখা তেরো স্বপ্ন! অজান্‌ করে আমাদের মন

লাফিয়ে উঠলো কৌতূহলের বিজলী চাবুক খেয়ে। সবাই মিলে এক বাক্যে বলে উঠলেম 'বলুন আপনার স্বপ্ন-কাহিনী। আসুন, এগিয়ে আসুন এদিকে।'

'না—না—না, এগোতে বলবেন না আমাকে। এইখানেই ভাল আছি।' এমনভাবে বলে উঠলেন সেই ভদ্রলোক, যেন তাকে এদিকে নিয়ে আসতে গেলেই তিনি ছুটে পালিয়ে যাবেন। মুখচোরা; একলা থাকার পিয়াসী, ভীরু স্বভাবের হয়তো ভদ্রলোক, তাই যতটা পারেন আড়ালে থাকতে চান। যেমন আমার অবস্থা আর কি! মঞ্চে উঠে দাঁড়াতে হলেই তার আগে পঞ্চভূতে মিলিয়ে যাবার রাস্তা খুঁজি।

বললুম 'থাক্ থাক্। আপনাকে আসতে হবে না। আপনি ঐখান থেকেই বলুন। আমরা নীরব হয়ে শুনি।'

সেই ভদ্রলোক বললেন 'বলতে আমি পারি, কিন্তু হয় তো আপনারা বিশ্বাস করবেন না। ভাববেন স্রেফ বানিয়ে বলছি। অবশ্য এমন অদ্ভুত মিল যে বিশ্বাস করাও শক্ত। অদ্ভুত! অদ্ভুত! অদ্ভুত!

নতুন ভদ্রলোকের মুখের ওপর যে আধ-আলো পড়েছিলো তাইতে লক্ষ্য করলুম ও চেহারা একেবারে এমন বিশেষত্বহীন যে মনে রাখা শক্ত। একশো লোকের ভিড়ে মিশে গেলেও এঁকে আর খুঁজে বার করা যাবে বলে মনে হয় না।

সেই ইংরিজী জানা ভদ্রলোক বললেন 'দেয়ার আর মোর থিংগস্ ইন্ হেভেন অ্যাণ্ড আর্থ হোরাশিও। মানে আমাদের বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না, এমন অনেক কিছু দুনিয়ায় আকছার ঘটছে।'

সবাই মিলে বললুম 'ঘটছেই তো। আর ঘটবেই। আটকাবে কে? বলুন আপনার কাহিনী। বিশ্বাস না করি তো এসে কান মলে দিয়ে যাবেন।'

'শুনুন তাহলে।' শুরু করলেন সেই বিশেষত্বহীন চেহারার ভদ্রলোক। 'এক ভদ্রলোক তাঁর এক জন্মদিনের রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন

এক মা কালীর মন্দিরে তেরোটি পাঁঠা বলির ব্যবস্থা হচ্ছে।'

শুনে জনার্দন বললে 'মা কালীর মন্দির? তেরো পাঁঠা? এ যে আমাদের এই—'

চটে মটে সেই ভদ্রলোক বললেন 'এই জন্যেই তো বলেছিলুম আপনাদের বিশ্বাস হবে না। থাক্ তাহলে কাহিনী।'

জনার্দনকে ধম্‌কে থামিয়ে ভদ্রলোককে আবার রাজী করালুম। ভদ্রলোক আবার শুরু করলেন 'স্বপ্নে ভদ্রলোক দেখলেন তেরোটি পাঁঠার গলায় ঝুলানো চাক্তিতে যার যার নিজের নম্বর লেখা। ভদ্রলোক নিজেও ঐ তেরো পাঁঠার এক পাঁঠা। গলায় ঝুলছে তাঁর তেরো নম্বরের চাক্তি!'

আমি বললুম 'অর্থাৎ স্বপ্নদর্শী ভদ্রলোক নিজেই তেরো নম্বর পাঁঠা?'

'ঠিক ধরেছেন। ভদ্রলোক নিজেই তেরো নম্বর পাঁঠা। ঢাকের বাদ্যি বেজে উঠলো টিমি টিমি টিমি টিমি, তারপর রাম-খাঁড়ার এক ঘায়ে ঘ্যাচাং করে নেমে গেল এক নম্বর পাঁঠার ধড়। সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গেল ঐ তেরো নম্বর পাঁঠা ভদ্রলোকের ঘুম। জেগে দেখেন ভয়ের গরমে সারা গা তাঁর ঘামে ভিজে গেছে। কয়েকদিন পর সে স্বপ্ন তিনি ভুলে গেলেন! এর পরের বছর জন্মদিনের রাতে আবার দেখলেন সেই স্বপ্ন, তফাৎ শুধু এবারে এক নম্বর পাঁঠা আর নেই। আছে বাকী বারোটি পাঁঠা—দু' নম্বর থেকে তেরো নম্বর। আর সেই তেরো নম্বর পাঁঠা তিনি নিজেই। এমনি করে ফি বছর তিনি স্বপ্ন দেখতে লাগলেন জন্মতিথির রাতে, আর ফি বছর একটি একটি করে পাঁঠা ঘ্যাচ্যাং করে কমে যেতে লাগলো। ক্রমে ক্রমে তাঁর নিজের ঘ্যাচ্যাং হবার পালা যতই এগিয়ে আসতে লাগলো ততই আতঙ্কে তাঁর আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হবার উপক্রম, কিন্তু গোড়া থেকেই ঐ স্বপ্ন কাহিনী তিনি নিজের মনেই গোপন রেখেছিলেন, কেউ বিশ্বাস

করতে চাইবে না বলে। বারো বছরে বারোটি পাঁঠা ঘ্যাচ্যাং হয়ে গেল। বাকী রইলেন তেরো নম্বর পাঁঠা সেই ভদ্রলোক। একটা গোটা বছর আতঙ্কে আতঙ্কে কাটালেন তিনি—আগামী বারের স্বপ্নে তাঁর পালা! এলো সেই আগামী বারের জন্মতিথির রাত। উদ্বেগে উদ্বেগে এর আগের তিন চার রাত জেগে কেটেছে তাঁর, সারারাত বিছানায় জেগে জেগে ছটফটানি এড়াতে পারে নি বাবা মা'র চোখ। তাঁরা শুধালেন কি হয়েছে। তিনি বললেন ও কিছু নয়, এমনি। বাপ ছিলেন ভালো ডাক্তার। জন্মতিথি উৎসব সাঙ্গ হতে রাত দশটা বাজলো। তেরো নম্বর পাঁঠা ভেবেছিলেন আজকের জন্মতিথির রাতটা প্রাণপণে জেগে থেকে স্বপ্নের ঘ্যাচ্যাং এড়িয়ে ফাঁড়া কাটাবেন, আর তাহলেই নিশ্চিন্দি। করতেনও তাই, আর পারতেনও করতে। কিন্তু বিধাতা পুরুষের বিধান ওল্‌টায় কার বাবার সাধ্যি? ভদ্রলোকের ডাক্তার বাবা ভাবলেন ক'টা রাত না ঘুমিয়ে কষ্ট পেয়েছে, আজকের শুভ জন্মতিথির রাতটা যেন আরামে ঘুমোতে পারে। তাই সরবতের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন এমন মোক্ষম ঘুমপাড়ানী দাওয়াই, যে তেরো নম্বর পাঁঠা ভদ্রলোকের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে জোর ঘুম এলো দু'চোখ জুড়ে। ঘুমিয়ে দেখলেন সেই বিষম স্বপ্ন। মা কালীর মন্দির, বাজছে কাঁসর ঘণ্টা, বাজছে ঢাকের বাদ্যি টি-ডিডি টি-ডিডি টিড্ডিডিডিম্। গলা আটকে দিলে হাঁড়িকাঠে। বাজনার আওয়াজ তো নয় যেন অ্যাটম আর হাইড্রোজেন বোমা এক সঙ্গে বাজছে। তারপর বলীবর্দ চেহারার বলি-দেনে-ওয়ালার হাতের খাঁড়া জয় মা কালী বলে ঝপাং করে নেমে এলো, আর—'

আমরা শ্রোতার দল উৎকণ্ঠ উৎকর্ণ তটস্থ হয়ে দুর্দান্ত কৌতূহলের স্রোতে ভাসছি।* উত্তেজনায় ফেটে চৌচির হবার অবস্থা।।

বললুম 'আর······?????'

'ঘ্যাচাং করে ভুঁয়ে লুটিয়ে পড়লো তেরো নম্বর পাঁঠার ছিন্নশির।'

লম্বা দৌড়ের পাল্লা শেষ করে যেন দম নিতে লাগলেন ভদ্রলোক।

আমরা শুধালুম 'পরদিন ভোরবেলা ?'

ভদ্রলোক একটু থেমে বিশ্রাম নিয়ে বললেন 'পরদিন ভোরে রোদ উঠে গেল, তবু তেরো-নম্বর পাঁঠা ভদ্রলোক ওঠেন না। দরজা ধাক্কানো হলো, তবু সাড়া নেই। দরজা ভেঙে প্রবেশ করে দেখা গেল ডাক্তারবাবুর ছেলের দেহে প্রাণ নেই, বিছানায় রক্ত, আর ক্ষুরের পোঁচ দিয়ে গলার এপাশ থেকে ওপাশ কাটা ; ক্ষুরের রক্তমাখা ফলা পড়ে আছে। ডাক্তার বাবা আর ডাক্তারগিন্নীমা কেঁদে ভাসালেন। খবরের কাগজে বেরুলো উদীয়মান যুবকের শোচনীয় আত্মহত্যা, কারণ অজ্ঞাত।'

অদ্ভুত কাহিনী শুনে আমরা স্তম্ভিত। নীরব। কিন্তু সেই ইংরিজী জানা ভদ্রলোক সহজে থামবার লোক নন। তিনি ফৌজদারী উকিলের মত জেরা করবার ভঙ্গীতে বললেন 'তেরো নম্বর পাঁঠা ভদ্রলোক তাঁর স্বপ্নের কথা যদি আগাগোড়া গোপনই রেখে থাকেন তাহলে হাউ ডিড ইউ নো ইট্ অ্যাট্ অল্ ? আপনি জানলেন কি করে ? হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ...... ! ! !'

সে হাসিতে আরো দু'চারজন যোগ দিলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। সেই গল্প-বলিয়ে ভদ্রলোক তাঁর ঐ আধো-অন্ধকার জায়গায় দাঁড়িয়ে উঠে গম্ভীর গা-ছমছম্-করানো রহস্যময় কণ্ঠে বললেন 'বন্ধুগণ ! বলবো না ভেবেছিলাম, কিন্তু আপনারা যখন আমার কাহিনী বিশ্বাস করছেন না, জেরা করে কোণঠাসা করতে চাইছেন, তখন আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনারা শুনুন।'

এখনি যেন একটা বোমা বিস্ফোরণ হবে, এমনি ভাবে আমরা নীরব হয়ে কান পেতে রইলাম।

ভদ্রলোক বললেন 'বন্ধুগণ ! আমিই সেই তেরো নম্বর পাঁঠা।'

সেই সঙ্গে মাথার ওপর বটগাছের ঘন পাতার আড়ালে একটা প্যাঁচা বিকট আওয়াজ করে ডেকে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে পাখা ঝাপটালো

কয়েকটা বাদুড়। মনে হলো গল্প-বলিয়ে ভদ্রলোক সেই সঙ্গে বিকট হেসে উঠলেন। তারপর তাকে আর দেখা গেল না। ততক্ষণে একটা ট্রেন এসে গেছে ইস্টিশানে, একদল যাত্রী আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছে মহাকালীর মন্দিরের দিকে।

কেউ কেউ রাম নাম জপতে লাগলেন ভূতুড়ে ব্যাপার ভেবে। কেউ কেউ ভাববার চেষ্টা করলেন লোকটা এই যাত্রীদের ভিড়ে মিশে গেছে। হয়তো যাবে মহাকালীর মন্দিরে তেরো পাঁঠার বলি দেখতে।

আমার হাত ধরে কেঁদে পড়লো জনার্দন। বললে এর একটা কিনারা করতেই হবে আপনাকে প্রভু। ব্যাপারটা ভূতুড়ে বলে গুজব রটে গেলে সন্ধ্যের পরে আমার সরাইখানায় ভয়েও কোনো খদ্দের ভিড়বে না। আপনি ওকে খুঁজে বার করুন প্রভু। উনি নিশ্চয় গেছেন বলি দেখতে। কোন ফাঁকে কেটে পড়েছেন আমরা কেউ টের পাইনি।

আমার ওপর অগাধ বিশ্বাস জনার্দনের। বললুম 'আচ্ছা। দেখি খুঁজে বার করতে পারি কিনা।'

মহাকালীর মন্দিরে গিয়ে যখন পৌঁছলুম ততক্ষণে তেরোটি পাঁঠা ঘ্যাচাং হয়ে গেছে। আমি সেই রহস্যময় ভদ্রলোকের চেহারা প্রাণ-পণে মনে করবার চেষ্টা করে সেই লোকের ভিড়ের ভেতর থেকে তাঁকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করতে লাগলুম।

আমার অমন গরু খোঁজা খুঁজতে দেখে এক সহৃদয় স্বেচ্ছাসেবক শুধালে 'আপনি কি কাউকে খুঁজছেন?'

আমি বললুম 'হ্যাঁ। তেরো নম্বর পাঁঠা।'

স্বেচ্ছাসেবক বললে 'সে তো এই একটু আগেই ঘ্যাচাং হয়ে গেল।'

আমি বললুম 'ও নয়। এ আরেক তেরো নম্বর পাঁঠা। চোখে চশমা, চুল কোঁকড়ানো, গোঁফ সরু—'

ছোকরা আমার দিকে চেয়ে হেসে চলে গেল। আমি খুঁজতে

লাগলুম। সে খোঁজা আজও শেষ হয়নি।

*

* *

মেঘলা দিন। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে বাইরে। ঘরে বসে বসে একটা বড় গল্পের প্লট ভাবছি। কল্পনার স্রোত বয়ে চলেছে হু-হু করে।

রাত্রি দশটা। বিখ্যাত শিল্পপতি এবং কোটিপতি বজ্রবিনোদ বনার্জী তাঁর একান্ত ঘরে একা পায়চারি করছেন অধীর সিংহের মতো। ঢং ঢং করে দেয়াল ঘড়িতে দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে থেকে দরজার বুকে টোকার আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল।

"এসো।" হুঙ্কার ছাড়লেন বজ্রবিনোদ।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল একজন যুবক। বেশ লম্বা, বেশ চওড়া, বেশ বেপরোয়া, যেন ভদ্রতা জানে অথচ কাউকে ভয় করে না।

রহস্যমাখানো ভারিক্কি হাসি হেসে বজ্রবিনোদ বললেন "এলে? আমি আশংকা করেছিলাম জেনেশুনে সিংহের খাঁচায় এসে ঢুকতে তুমি সাহস পাবে না।"

"সিংহকে শেয়াল হয় তো ভয় করতে পারে, কিন্তু রয়েল বেংগল টাইগার করে না।" বলার সঙ্গে সঙ্গে যুবকটি বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালে হয় তো ভালো হতো, কিন্তু তা সে দরকার মনে করলে না। অতটা সম্মান ও যেন দিতে চায় না বজ্রবিনোদকে।

"শুনে বড় খুশী হলাম। বাংলাদেশে এখনো বাঘ আছে তা'হলে? রামধারী!" বললেন বজ্রবিনোদ! দরজা খুলে এসে দাঁড়ালো রামধারী দারোয়ান।

"বাইরে থেকে এ ঘরের একমাত্র দরজায় তালা লাগিয়ে দাও। আমি না বললে খুলবে না।" বললেন বজ্রবিনোদ।

চলে গেল "যো হুকুম" বলে রামধারী।

সেই যুবকটি তখন যেভাবে অবলীলাক্রমে একটা সোফার ওপর বসে

পড়ে মৃদু হাসল তাতে মনে হল যেন বলতে চাইছে "ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।"

"জানো তুমি এখন আমার হাতের মুঠোয়? ইচ্ছে করলে তোমায় আমি পিষে মারতে পারি?" বললেন বজ্রবিনোদ। বলে যুবকের বিপরীত দিকে একটা বড় টেবিলের ধারে চেয়ারে বসে পড়লেন।

যুবকটি এইবার অট্টহাস্য করে বলল "আপনার ঐ রামধারী দারোয়ানের মত দু'চারটের মহড়া একা নিতে অনায়াসে পারে এই অপূর্ব সান্যাল।" বলে আপন আটচল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতিতে চাপড় লাগাল।

"মূর্খ যুবক, রামধারী দারোয়ান নয়, আমি এই দু'হাতে তোমায় পিষে ফেলতে পারি। বয়সে তোমার পিতৃতুল্য হলেও বাহুবল আমার আজো অক্ষুণ্ণ রয়েছে। দেখবে তার প্রমাণ?"

"দেখব।" বললে যুবক।

একটা মোটা লোহার ডাণ্ডা মেঝের ওপর নীরবে শুয়েছিল বজ্র-বিনোদের পায়ের কাছে। সেটি অনায়াসে তিনি বাঁ হাতে তুলে নিলেন। তারপর রামচন্দ্র যেমন করে হরধনু ভঙ্গ করেছিলেন, তেমনি ভঙ্গীতে ডাণ্ডাটিকে তিনি শুধু দুদিকে দুহাতের চাপ দিয়ে বাঁকিয়ে ফেললেন অর্ধবৃত্তের আকারে।

কিন্তু যুবকের মুখে-চোখে এক ফোঁটা ভয়ের চিহ্ন দেখা গেল না। সে বললে "এ সব বাজে ব্যাপারে সময় নষ্ট না করে কাজের কথা শুরু করুন। আমাকে ভয় দেখাবার বৃথা চেষ্টা করবেন না। কেন ডেকেছেন আমাকে?"

"তুমি আমার কারখানার কর্মিদের আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী বানিয়ে তুলবার চেষ্টা করছ, এ কথা সত্যি?"

"এ কথার জবাব আমি দেবার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব আপনি দিন। আজ লক্ষ লক্ষ টাকা আপনার কাছে খোলামকুচির

মতো। অথচ একদিন আপনি ছিলেন সর্বহারা পথের পথিক, কত রাত্রি কত দিন আপনাকে শুধু কলের জল খেয়ে কাটাতে হয়েছে, একবার ক্ষুধার তাড়নায় এক ডজন বিস্কুট চুরি করে আপনাকে হাজতে বাস করতে হয়েছিল, আর একবার—"

"থামো, অর্বাচীন যুবক। অতীতের প্রসঙ্গ বর্তমানে একান্তই অবান্তর।"

"রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি হবার সাহস যদি নেই, তাহলে কোন ভরসায় আপনি ডেকে এনেছেন অপূর্ব সান্যালকে? সত্যের জন্য অপূর্ব সান্যাল প্রাণ দিতে পারে, প্রাণ নিতেও পারে। প্রমাণ চান তো এই মুহূর্তে দিতে পারি। আপনি ভীরু, আপনি কাপুরুষ, আপনি—"

"সাবধান যুবক!" সিংহের মত হুঙ্কার ছাড়লেন বজ্রবিনোদ। যুবক অপূর্ব সান্যাল চেয়ে দেখল তার বুক লক্ষ্য করে পিস্তল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন বিপুলকায় বৃদ্ধ, তাঁর দুই চোখ থেকে যেন আগুনের ফোয়ারা ঝরে পড়ছে।

"মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও অপূর্ব সান্যাল।" বলতে লাগলেন বৃদ্ধ। "সত্য বলেছ তুমি। পথের ভিখারীই ছিলাম একদিন। বহু লাঞ্ছনা, বহু অপমান, বহু অবহেলা সইতে হয়েছে বহুদিন, বহু সপ্তাহ, বহু মাস, বহু বছর। তারপর একদিন সহসা সুযোগ এলো নিতান্ত অপ্রত্যাশিত-ভাবে। পথ পেলাম অর্থ উপার্জনের। সেই থেকে প্রাণপণ চেষ্টায় গড়ে তুললাম অতি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান। সেই প্রতিষ্ঠানই আজ সারা দেশের অন্যতম সেরা কারখানা, যার একচ্ছত্র মালিক—আমি, বজ্রবিনোদ বনার্জী, যার স্বপ্ন এখনো শেষ হয়নি, যে এখনো স্বপ্ন দেখছে এ কারখানা সে আরো আরো বড় বানিয়ে তুলবে যে পর্যন্ত না এ কারখানা সারা এশিয়ায়, তথা সারা বিশ্বে—"

"কিন্তু শ্রমিকদের শুকিয়ে রেখে তাদের রক্ত তিলে তিলে শোষণ করে তাদের বুকের অস্থির ওপর আরো বিরাট কারখানার পত্তন করবার

স্বপ্ন আপনি দিবারাত্রি যতই দেখুন, অপূর্ব সান্যাল জীবিত থাকতে তা কখনো সফল হবে না।"

"তা জানি। আর সেই জন্তেই তোমাকে আহ্বান করে এনেছি, তোমায় আমার প্রাসাদোপম অট্টালিকার এই নিভৃত কক্ষে হত্যা করব বলে। তারপর তোমার মৃতদেহ এই কক্ষের পেছনের ভূমিখণ্ডে সমাহিত করে তার ওপরকার মাটিতে ছড়িয়ে দেবো সবুজ ঘাসের বীজ। ইষ্টনাম স্মরণ করো অপূর্ব।"

কিন্তু অপূর্ব সান্যালের ইষ্টনাম স্মরণ করবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। সে বললে "বজ্রবিনোদ বনার্জী মহাপুরুষ বা বীরপুরুষ, এ সন্দেহ মনে কোনোদিন উঁকি দেয়নি, কিন্তু তিনি যে মহা কাপুরুষ এও জানা ছিল না।"

"কাপুরুষ???" চিৎকার করে উঠলেন বজ্রবিনোদ। সেটা তাঁর হুঙ্কার, না আর্তনাদ বোঝা গেল না।

"আমন্ত্রিত নিরস্ত্র অতিথিকে বাগে পেয়ে তার বক্ষ লক্ষ্য করে পিস্তল চালাতে উদ্যত হওয়াকে মহাবীরত্বের লক্ষণ বলে আশা করি আপনিও দাবি করবেন না?"

"তবে এই নাও পিস্তল, ভীরু যুবক। যদি সাহস থাকে, হত্যা করো আমাকে। হত্যা করে আমার পেছন দিকের জানালা দিয়ে বাগানে লাফিয়ে পড়ে যেখানে খুশি পালিয়ে যাও, কেউ তোমায় গ্রেপ্তার করবে না। এই নাও পিস্তল।"

অপূর্ব সান্যালের হাতে পিস্তলটি গুঁজে দিলেন বজ্রবিনোদ। তারপর বুকের জামা খুলে চিৎকার করে উঠলেন "মারো মারো মারো আমাকে অপূর্ব। চালাও গুলি।"

পিস্তল উঁচিয়ে দাঁড়াল অপূর্ব। দুই চোখে তার গভীর একাগ্র দৃষ্টি। দেয়ালের গায়ে একটা টিকটিকি একটি পোকাকে লক্ষ্য করছিল; সে থমকে থেমে রইল। দেয়াল-ঘড়ির পেণ্ডুলাম দুলতে লাগল টক্ টক্ টক্।

কিন্তু গুলি চালাল না অপূর্ব সান্যাল। পিস্তলটা ফিরিয়ে দিয়ে বললে "ছিঃ! কি ছেলেমানুষি করছিলেন বলুন তো? ঝোঁকের মাথায় যদি ঘোড়া টিপে বসতুম?"

বজ্রবিনোদ বললেন "মূর্খ! মূর্খ! মূর্খ! পিস্তলে একটিও টোটা ভরা নেই।"

একটু থেমে বললেন "আর ঐ যে ডাণ্ডাটি দেখছো, যাকে অবলীলাক্রমে বাঁকিয়ে ফেললাম, ওটি তোমার হাতেও অবলীলাক্রমে বেঁকে যেতো। ওটি সীসের তৈরি, সার্কাসী মেকি পালোয়ানদের পালোয়ানী খেলা দেখাবার জন্যে।"

যুবক কিছুক্ষণ নীরব রইল। তারপর হো হো করে হেসে উঠল। তারপর বলল "আপনার স্ত্রীর যখন মৃত্যু হয় তখন আপনি ভাগ্যের সন্ধানে ঘুরছিলেন। আপনার একমাত্র সন্তান, একমাত্র পুত্র, মাত্র দুবছর বয়সে মাতৃহারা হয়েছিল। আপনি অর্থোপার্জনের সরু রাস্তা বেয়ে তারপর যখন এলেন স্ত্রীর সন্ধানে, তখন শুনলেন তাঁর মৃত্যু হয়েছে, আর তাঁর পুত্রকে দেখে মুগ্ধ হয়ে এক পুত্রকামী পুত্রহীন ব্যক্তি তাকে নিয়ে পালিয়েছে। সত্য একথা?"

"সত্য। কিন্তু তুমি কি করে এ খবর পেলে অপূর্ব? কার কাছে?"

"অতি বিশ্বস্তসুত্রে। আপনি আশা ত্যাগ করলেন না। ধনকুবের হবার সাধনায় মেতে গেলেন এই আশায় যে, সেই হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে আপনি এক দিন না এক দিন ফিরে পাবেন, আর সে এসে আপনার এই অতুল ঐশ্বর্য ভোগ করবে। সত্য?"

"সত্য। কিন্তু—"

"কিন্তু নয়। সেই একমাত্র পুত্রের হাতে অতুল ঐশ্বর্য তুলে দেবার জন্যে আপনি পুঁজিবাদের সব রকম হীনতা নিজের ভেতরে জড়ো করেছেন। আমি পণ করেছি প্রাণপণে বাধা দেবো আপনার শোষণে। আমার জীবনে কোনো বন্ধন নেই, পিছুটান নেই, তাই প্রাণের মায়াও আমার

অল্প, মৃত্যুভয় নেই বললেই চলে। বিশ বছর বয়সে যাকে হারিয়েছি তিনি মৃত্যুকালে বলে গেছেন, যদিও তাঁর পদবীই জোড়া রয়েছে আমার নামের শেষে, তিনি আমার পিতা নন।"

"তবে কে, কে, কে তোমার পিতা, অপূর্ব?" আর্তকণ্ঠে বলে উঠলেন বজ্রবিনোদ।

"সে কথা তিনি বলে যেতে পারেন নি।" বললে অপূর্ব সান্যাল।

—কিন্তু ঐ আসছেন শেঠ কিষেণলাল ভরদ্বাজ আমারই ঘরের দিকে লক্ষ্য করে। গল্পের প্লট তাহলে আজ এ পর্যন্তই থাক।

"আপনার কাছে ছুটে এলাম, ধন্‌পতিবাবু।" বললেন শেঠ কিষেণলাল ভরদ্বাজ। "পালিয়ে এলাম ঘর ছেড়ে।"

"কেন?"

"রেডিও-তে সানাই বাজছিল আমার ঘরে।"

"তাই পালিয়ে এলেন?"

"তাই পালিয়ে এলাম। দূর থেকে শুনব বলে।"

"কিন্তু আমার কাছে কেন?"

"আপনাকে শুনাব, আপনার সাথে শুনব।"

বসলেন শেঠজী আমার পাশে। দূর থেকে ভেসে আসছিল সানাই-সঙ্গীত।

"তিলক কামোদ বাজাচ্ছে মক্‌বুল হোসেন।" বললেন শেঠ কিষেণলাল ভরদ্বাজ। "বুড়ো বাজিয়ে। সেরা বাজিয়ে। খেয়ালী বাজিয়ে। স্পেশ্যাল প্রোগ্রাম। আধ ঘণ্টা বাজাবে।"

থেমে রইল—আমার গল্পের প্লটের অগ্রগতি। "কে—কে—কে তোমার পিতা, অপূর্ব?" এই এক প্রশ্ন তানপুরোর একটানা ঝংকারের মতো ঝংকৃত হতে লাগল কোটিপতি শিল্পপতি বজ্রবিনোদ বনার্জীর হৃদয়ে।

"সে কথা তিনি বলে যেতে পারেন কি ?" নির্ভীক তরুণ অপূর্ব সান্যালের আটচল্লিশ ইঞ্চি বুকের ভেতর ধ্বনিত হতে লাগল এই জবাব।—আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলাম শেঠজীর ঘরের বেতারযন্ত্র থেকে ভেসে-আসা তিলক কামোদ, বাজাচ্ছে মকবুল হোসেন সানাই-ওয়ালা। বুড়ো মকবুল।

মন্ত্রমুগ্ধ না হয়ে উপায় ছিল না, কারণ একবার কথা কইবার জন্য মুখ খুলেছি কি না খুলেছি অমনি নিজের দু'টি জোড়া ঠোঁটের ওপর ডান হাতের তর্জনী চেপে শেঠজী ইশারা করলেন "চুপ!" আর বাঁ হাতে বাঁ কানের রন্ধ্রের দিকে ইঙ্গিত করে বোঝালেন "শুনুন।"

দেখলাম, ছলছলিয়ে উঠেছে শেঠজীর দু'টি চোখ। বাতাসের ঢেউয়ে ঢেউয়ে কাঁদছে মকবুল হোসেনী সানাই-র তিলক কামোদ। তার পেছনে পোঁ-ধরা বাঁশীর একটানা একঘেয়ে সুর, আর তার-ই সঙ্গে তালের বাঁধনের ভেতর বৈচিত্র্যের মুক্তি খুঁজে চলেছে তবলচীর তেরেকেটে।

আধ ঘণ্টা কোথা দিয়ে কেটে গেল জানি না। কিন্তু কেটে গেল।

"সানাই বাজিয়ে চুল পাকিয়েছে মকবুল হোসেন।" বললেন শেঠ কিষেণলাল ভরদ্বাজ। "অবশ্য চুল ওর এমনিতেও পাকত। কিন্তু এমনিতে পাকায়নি মকবুল। এইখানেই ওর ট্রেড সিক্রেট। আপনি হয় তো জানেন না, মকবুলের বাবার ছিল মাংসের দোকান, ঐ দোকানে অনেক পাঁঠা আর অনেক খাসি কেটে কেটে ওজন দরে বেচেছে মকবুলের বাপ ছামিদুল।"

"এত খবর আপনি শুনলেন কোথায় ?"

"মকবুল হোসেনের মুখে।" বললেন শেঠ কিষেণলাল। "শকুন্তলার বিয়েতে সানাই বাজাবার জন্যে ওকে আড়াই হাজার টাকা দাদন দিয়ে রেখেছিলেম। কড়ার ছিল গোটা আষাঢ় মাসটা অপর কোনো বিয়েতে সানাই ছোঁবে না মকবুল, আর আষাঢ়ের পয়লা

তারিখেই, ঠিক করেছিলাম, শকুন্তলার বিয়ে হবে।"

"আপনার মেয়ে শকুন্তলা?"

"নয় তো কি পরের মেয়ের জন্যে আমি সানাই বায়না করব, ধনপতিবাবু? তারপর শুনুন। শকুন্তলাকে বলিনি আমার মতলবের কথা। বেটি গরীবের ছেলে দুষ্মন্ত তেন্দুলকারকে ভালোবেসেছে বেশ করেছে, আমার নারাজ হবার কি আছে তাতে? দুষ্মন্ত গরীবের ছেলে আছে তো কি আছে, তাকে রাতারাতি বড়লোকের জামাই বানানো তো আমার এক তুড়ির কারবার। কিন্তু জানেন তো, শেষটা দুষ্মন্ত ছোকরাই বিলকুল ভেগে গেল, আমার বেটি শকুন্তলার মন ভেঙে দিয়ে। মূর্খ, বেকুব, উজবুক দুষ্মন্ত তেন্দুলকার।"

"তাকে কি ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছিলেন মেয়ের মুখ চেয়ে?"

"কাগজে কাগজে দুষ্মন্ত ফিরে এসো বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে? হয়তো তাই করতাম, কিন্তু করতে দিত না শকুন্তলা। বলত, কাজ নেই বাবা, যে চলে গেছে তা'কে চলে গিয়েই থাকতে দাও। ভালোবাসার মান দিতে যে পারলে না তা'কে ডেকে ফেরাবার অপমান ডেকে আনতে রাজী হত না শকুন্তলা। তাই বেটিকে বললাম, পয়লা আষাঢ়ে ওর হাত আর লছমনপ্রসাদ ঠনঠনিয়ার নাতি রামমনোহর ঠনঠনিয়ার হাত, এই দু'হাত এক বানিয়ে দিই, কিন্তু জবর রকম নারাজ হল শকুন্তলা। বাতিল করে দিলে পয়লা আষাঢ়, বাতিল করে দিলে বিয়ের কথা। তখন খবর পাঠিয়ে দিলাম মকবুলকে চুক্তি থেকে মুক্তি দিয়ে, জানিয়ে দিলাম হবে না শকুন্তলার বিয়ে, বাজাতে হবে না সানাই আমার গরীবখানায়, ইচ্ছে হলে সারা আষাঢ় মাস যেখানে খুশি সেখানে যত খুশি সানাই বাজাতে পারে। তখন মকবুল কি করলে জানেন?"

"জানি নে।"

"একদিন আমার বাড়ি এসে হাজির, পঁচিশখানা একশো টাকার নোট নিয়ে। বললে, ফেরত নিতে হবে। বাজানোর ব্যবস্থা যখন

বাতিল হয়ে গেল তখন বায়নার টাকা রাখবে না মকবুল হোসেন সানাইওয়ালা। কিছু না দিয়ে কিছু নিয়ে নিজেকে খেলো বানাতে রাজী নয় সে। অথচ আমারও জেদ যে টাকা একবার দিয়েছি সে টাকার একটি আধলাও ফেরত নেবো না।"

"তারপর ?"

"একটা রফা করলাম যাতে তু'য়েরই জেদ বজায় থাকে, কারো মান খোয়া না যায়। ঐ আড়াই হাজার টাকার বদলে ওর সানাইওয়ালা হবার ইতিহাস শোনালে মকবুল একদিন সারা তুপুরবেলা। সে অনেক লম্বা কাহিনী। তার দাম আড়াই হাজার টাকার চাইতে ঢের বেশী। জিত হলো আমার, বললাম মকবুলকে। চলে গেল মকবুল টাকা ফেরত নিয়ে। পরে শুনলাম ও টাকা সে রাখে নি, দান করে দিয়েছে এক দাতব্য হাসপাতালের ফাণ্ডে।"

"কিন্তু কি কাহিনী আপনাকে শুনিয়ে গেল মকবুল হোসেন ?" শুধালেম আমি।

"সে কথা গুছিয়ে বড় করে শোনাব আপনাকে একদিন।" বললেন শেঠ কিষেণলাল। "আজ ছোট করে বলি শুন্থন।"

শোনালেন ছোট করে সেই কাহিনী। পাঁঠা-খাসির মাংসের দোকান ছিল মকবুলের বাপ হামিতুলের। মাংসের কিমা বানাবার বাদ্‌শা ছিল হামিতুল ; ও ব্যাপারে সারা শহরে জুড়ি ছিল না তার। হিন্দু-মুসলিম মিলনের একটি পাকা কেন্দ্র ছিল হামিতুলের মাংসের দোকান। হিন্দু পাঁঠা মুসলিম পাঁঠার যেমন ভেদ ছিল না হামিতুলের কাছে, তেমনি ছিল না এই তুই ধর্মের খদ্দেরে খদ্দেরে। পাঁঠার পর পাঁঠা, খাসির পর খাসি খণ্ডিত হয়ে চলে যায় খদ্দেরের ঘরে, হু-হু করে খদ্দেরের অর্থ আসে হামিতুলের ট্যাঁকে। কিন্তু তু'হাতে টাকা ফুঁকে দেয় হামিতুল, বেহিসেবি, বেপরোয়া, মহা উড়নচণ্ডী। একটু বাবুয়ানার শখ। দামী সিল্কের লুঙ্গি, দামী জমকালো নাগরা, দামী সিল্কের পাঞ্জাবি পরে আতরের

খুশবু ছড়িয়ে, গোঁফে তা দিয়ে যখন বেড়াতো তখন তাকে দেখে কেউ কল্পনাও করত না এই হামিদুলই দোকানে বসে তাজা জানোয়ার জবাই করে তাদের মৃতদেহ আপন হাতে টুকরো করে, কুচিয়ে কাটে।

জঘন্য গলার আওয়াজ হামিদুলের, সুরতালের ত্রিসীমানাও মাড়ায় না কখনো। হঠাৎ একদিন কি খেয়াল চেপেছিল, গিয়েছিল এক ঘরোয়া গান বাজনার আসরে, বদরুদ্দীন সাহেবের বাড়ির ভেতরের উঠোনে। সঙ্গে তার বাচ্চা ছেলে মকবুল। আসরের কয়েকজন তাকে কোনো গাইয়ে বা বাজিয়ে বলে ভুল করে খাঁ-সাহেব বলে সম্বোধন করে ফেলেছিল। সাময়িক ভুল বটে, কিন্তু মজা লাগার সঙ্গে সঙ্গে একটু আফসোসও হয়েছিল হামিদুলের। ফিরবার পথে বলেছিল মকবুলকে "খাঁ-সাহেব হবার রাস্তা খোদা দেননি। কিন্তু তুই ব্যাটা আমাকে খাঁ-সাহেবের বাপ বানাতে পারবি নে ?"

মকবুল তখন অতশত কিছু ভাবেনি, অনায়াসে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে বলেছিল "আলবাৎ পারবো আব্বাজান।"

"সাবাস !" বলে ছেলের পিঠ চাপড়ে দিয়েছিল হামিদুল।

এরপর বেশীদিন বিগত হবার আগেই এক খুনের মকদ্দমায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলে হামিদুল। নৃশংস খুন। হামিদুলের সহ-আসামী বেকসুর খালাস পেয়ে গেল হামিদুলের বিস্তৃত স্বীকারোক্তিতে, হামিদুলের হলো ফাঁসির হুকুম। অনেকে এক বাক্যে বললে "ব্যাটা কসাই।" অনেকে খুশী হলো ওর ফাঁসির হুকুমে, কিন্তু খুশী হলো না আসামী পক্ষের উকীলবাবু। তিনি একরকম অনায়াসেই বাঁচাতে পারতেন হামিদুলকে, নির্ঘাত ঝুলত হামিদুলের সহ-আসামী। কিন্তু হামিদুলের জেদে, হামিদুলের শাসানিতে বাধ্য হয়ে তাঁকে এমন মকদ্দমা চালাতে হল যাতে হামিদুলের ওপর সকলের সন্দেহ একেবারে দৃঢ়বিশ্বাসে পরিণত হয়। উঠতি বয়সের জোয়ান ছোকরাকে তার হঠাৎ করে-ফেলা দুষ্কর্মের নিশ্চিত চরম শাস্তি থেকে বাঁচাবার জন্যে, তার চাইতে

বেশি একটি আলয়মাতৃত্ব সরলা. কিশোরীকে নিষ্ঠুর বৈধব্য থেকে বাঁচাবার জন্যে দড়ির ফাঁসের ভেতর আপ্রাণ চেষ্টায় গলা বাড়িয়ে দিলে প্রৌঢ় 'কসাই' হামিদুল।

হামিদুলের ফাঁসি হয়ে গেল একদিন শেষ রাতে জেলের প্রাচীরের আড়ালে ফাঁসি কাঠে। মকবুল হোসেন তখন বালক। কবে কখন ফাঁসি হবে জানা ছিল মকবুলের। আর জানা ছিল খুন না করে ইচ্ছে করে খুনের দায় ঘাড়ে নিয়ে পরের জান বাঁচাতে নিজের জান দিচ্ছে আব্বাজান, আব্বাজান মরতে ডরাচ্ছে না একটুকু। অনেক পাঁঠা-খাসির জান নিয়েছে অনায়াসে, এবার নিজের জানও দেবে অম্লানবদনে।

জেলখানার উঁচু পাঁচিলের পাশ দিয়ে সরু খাল। খালের ওপর ঝুলছে সেতু, তার ওপর দিয়ে তখনো শুরু হয়নি যানবাহনের যাওয়া আসা। সেতুর মাঝামাঝি কিনারা ঘেঁষে এসে দাঁড়ালো মকবুল।

রহমান চাচা বোধকরি বাড়িতে বসে ছটফট্ করছেন ভাই-জানের জন্য। তাকে না জানিয়েই চুপি চুপি পালিয়ে এসেছে মকবুল জেল-খানার ধারে এই সেতুর ওপর।

শেষ রাত্রের স্তব্ধতা ভঙ্গ করে কোথায় যেন ঢং ঢং করে বেজে উঠল ঘড়ির ঘণ্টা। সময় হয়েছে, এবার ফাঁসির তক্তায় তুলেছে আব্বাজানকে। খোদার কাছে প্রার্থনা জানালে মকবুল, আব্বাজানের জন্যে।

এমনি সময় দূরে কোথায় বেজে উঠল সানাই। "পিয়া মিলনকী আস" গানের সানাই বাজছে ভোরাই যোগিয়া রাগিণীতে। আশ্চর্য করুণ, আশ্চর্য মধুর সানাইর সুর, ঐ সুর কানে নিয়ে শেষ যাত্রাপথে রওনা হয়ে যাবে আব্বাজান, আম্মাজান ওপারে প্রতীক্ষা করছে তারই জন্যে। প্রিয়া মিলনের আশায় এপারের সীমানা ছাড়িয়ে ওপারে রওনা হয়ে যাচ্ছে আব্বাজান, তার কানে শেষ মধু ঝরাবে বলে বাজছে সানাই।

সেই মুহূর্তে সেই সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে মকবুল শপথ করলে সানাই

সঙ্গীতের যাদুকর হবার সাধনায় উৎসর্গ করবে নিজের সারা জীবন। খাঁ সাহেবের বাপ হতে চেয়েছিল আব্বাজান; তার সে সাধ অপূর্ণ রাখা চলবে না। সানাই-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতেই হবে—তার এপারের সানাই মুগ্ধ হয়ে শুনে তৃপ্ত হবে আব্বাজান ওপার থেকে।

আমি বললাম "বিশ্বাস করা শক্ত, শেঠজি।"

"কোন্ কথাটা?"

"ঐ যে বললেন সানাই-সম্রাট মকবুল হোসেনের বাবার ছিল কসাই-দোকান।"

"একটা কথার মত কথা বলেছেন ধন্‌পতিবাবু।" খুশী হয়ে বললেন শেঠ কিষেণলাল। "বাস্তবিকই বিশ্বাস করা শক্ত। দুনিয়ায় অনেক মিথ্যে কথা বিশ্বাস করা যেমন সোজা, অনেক সত্যি কথা বিশ্বাস করা তেমনি শক্ত। আচ্ছা, মকবুল হোসেনের সানাই তো শুনলেন?"

"শুনলাম। আগেও অনেক শুনেছি।"

"শুনে কেমন মনে হয় সানাই ওস্তাদকে?"

আমি বললাম "শেক্‌স্‌পীয়ারের নাম শুনেছেন?"

"শুনিনি।"

"ইংরেজ কবি। যিনি এক জায়গায় লিখে গেছেন সঙ্গীতে যে রস পায় না সে মানুষ খুন করতে পারে। সে মানুষ বিপজ্জনক, তাকে খবরদার বিশ্বাস করবেন না।"

"সঙ্গীত-মাতাল মানুষও খুন করতে পারে, এ কথা শেক্‌স্‌পীয়ার কোথাও লিখে গেছে?"

"না, এমন কথা লেখেন নি তিনি।"

"তা হলে উজবুগ, উজবুগ, একদম উজবুগ লোকটা।"

"কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যের সেরা সেরা মাতব্বর—কোল্‌রীজ, ম্যাথু আর্নলড্ ডাউডেন, ব্রাড্‌লি, স্টপফোর্ড ব্রুক, আরো আরো আরো অনেকে—একবাক্যে চিৎকার করে বলেছেন মহামতি শেক্‌স্‌পীয়ার

মানব-চরিত্রকে একেবারে গুলে খেয়ে হজম করে রেখেছেন।”

“ওগুলো তাহলে শেক্‌স্‌পীয়ারের চাইতে আরো বড় গবেট।” বললেন শেঠজী।

শেক্‌স্‌পীয়ারের প্রতি শেঠ কিষেণলালের এই মর্মান্তিক তাচ্ছিল্যে মর্মাহত হয়ে বললাম “শেকস্‌পীয়ারের গ্রন্থাবলী হচ্ছে মানব চরিত্রের বিরাট চিড়িয়াখানা, এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা।”

আরো গম্ভীর তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে শেঠজী বললেন “মানব-চরিত জানবার জন্যে যেদিন এই ইংরেজ চিড়িয়াখানা-ওয়ালার পুঁথি পড়ার দরকার হবে ধনপতিবাবু, তার আগে ডিস্‌পেনসারি থেকে এক ডোজ পটাশিয়াম সায়ানাইড আনিয়ে নিব। ছেড়ে দিন ওর কথা। মকবুল-চরিত কি বুঝবে আপনার শেকস্‌পীয়ার ?”

শেকস্‌পীয়ারের পক্ষে শেঠজীর আদালতে আর ব্যারিস্টারি করতে অগ্রসর হলাম না।

“হাওয়ায় হাওয়ায় অমৃত ছড়িয়ে দেয় মকবুল হোসেনের সানাই।” বললেন শেঠজী। “মনে হয় স্বর্গ থেকে ভেসে আসছে সুর, এমন মিঠে সুর যে সৃষ্টি করে সে মানুষটা বুঝি কত মিঠে। কিন্তু আপনি জেনে রাখুন ধনপতিবাবু, সানাই বাজাচ্ছে যে মকবুল সে এক মানুষ, আর সানাই ছাড়া মকবুল হোসেন বিলকুল আলাদা মানুষ। মানুষ খুন না করে ফাঁসি গেছে মকবুলের বাপ ; মকবুল যদি মানুষ খুন করে ফাঁসি যায় তাহলেও আমি অবাক হবো না।”

“সে কি ? মকবুল হোসেন—”

“হৃদয়হীন, একেবারে হৃদয়হীন লোকটা।” বললেন শেঠজী। “ওর বাপ হামিদুল ছিল কসাই, অনেক ইতর প্রাণীকে প্রাণহীন আর ছালহীন করে কুচিয়ে কেটে বিক্রি করেছে, কিন্তু শুনেছি মিঠে মেজাজের মানুষ ছিল সে! দিল ছিল ওর হীরের টুকরো। পাঁঠাখাসীর দুঃখে কখনো কাঁদেনি, কিন্তু মানুষের দুঃখে হৃদয় কাঁদত হামিদুলের। আর

এই কান্নার ব্যাপারে হিন্দু-মুসলিম্‌-খ্রীষ্টানে ভেদ ছিল না তার। কিন্তু মকবুল—"

"মকবুল...?...??...???"

"ঐ যে বললাম একেবারে হৃদয়হীন। কটি শাদী করেছিল জানেন?"

"ক'টি?"

"চারটি। তার ভেতর ছুটি আত্মহত্যা করেছিল ছ'রকম কায়দায়। একটি গলায় দড়ি, আরেকটি কেরোসিনে স্নান করে তারপর অগ্নিস্নান।"

"কেন?"

"সুর-যাত্নকর স্বামীর অসুরপনায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। বাইরের আসরে, সভায়, সম্মেলনে, মাইফেলে সর্বত্র হাজারো মানুষকে সুরের দোলায় কাঁদিয়ে জয়জয়কার করে বাড়ি ফিরে...কিন্তু থাক্ সেসব পাষণ্ড আচরণের কথা। আপনার ভেঙে যাবে কল্পনার মধুর স্বপ্ন, কোমল হৃদয়ে ব্যথা পাবেন আপনি। স্ত্রীর অসহায় দেহে চাবুক চালিয়েছে সানাই-যাত্নকর দিনের পর দিন, এ ধরনের কাহিনী শুনতে আপনার ভালো লাগবে না।"

"সত্যি বলে বিশ্বাস করাও শক্ত, শেঠজি।" বললাম আমি। "কিন্তু আরো ছুটি স্ত্রী বাকী রইল মকবুল হোসেনের।"

"ঐ ছুটির মধ্যে এক বিবিকে তালাক দিয়েছিল মকবুল। সে বিবি তারপর কি একটা ব্যামোয় মারা গেল—টাইফয়েড না ম্যালেরিয়ায় মনে নেই, এক রকম বিনা চিকিৎসায়। ইচ্ছে করলে অনেক পয়সাই চিকিৎসার জন্য দিতে পারত মকবুল—কিন্তু একটি আধলাও দেয়নি।"

"চার নম্বর স্ত্রী?"

"শুনেছি এখনো বেঁচে আছে ফতেমা বিবি। পয়সাওয়ালা বাপের মেয়ে; পয়সাওয়ালা, পসারওয়ালা, হিম্মতওয়ালা বাঘা মেজাজের ছ'ভায়ের মাঝামাঝি এক বোন; রূপের জোর, রূপোর জোর আর বাঘিনীর মেজাজ

নিয়ে মকবুলের ঘরে এসেছিল ফত্তেমা বিবি। এই চার নম্বরের কাছে কাবু হতে বাধ্য হয়েছিল মকবুল হোসেন। এখনো সেই কাবুই আছে। কিন্তু আমার কি মনে হয় জানেন?"

"কি মনে হয়?"

"মকবুল হোসেনের সানাই শুনে আমি আত্মহারা মাতাল হয়ে উঠি, চোখের জল রাখতে পারিনে। কিন্তু ওর সানাই শুনে যত বেশী মুগ্ধ হই তত বেশী মনে হয় এখনো প্রয়োজন হলে অনায়াসে আপন হাতে মানুষ খুন করতে পারে মকবুল। সানাইতে যেমন মীড় তোলে অনায়াসে, তেমনি অনায়াসে—অবশ্য ধরা পড়ে ফাঁসি যাবার ভয় না থাকলে। কিন্তু থাক্ এখন মকবুল হোসেনের কথা। বসে বসে একটু মেঘলা আকাশ দেখা যাক।"

আমি বললাম "দেখুন।" বসে বসে মেঘলা আকাশ দেখতে লাগলেন শেঠ কিষেণলাল ভরদ্বাজ।

নবাব উজবেক আলী খাঁ বলছিলেন আর আমি শুনছিলাম। তিনি বলছিলেন: "আজ-কাল এই যে-কামরায় আমায় থাক্‌তে হচ্ছে, আমার এক একটা বাবুর্চি খানসামা থাকতো এর তুলো কামরায়। সে সব কি দিন ছিল, আর এই কি দিন। লালন ফকির ঠিকই বলেছিল: অ্যায়সা দিন নেহি রহেগা।......

"আজ দেখছেন চুল সাদা, দাড়ি সাদা, চেহারার সে জলুস নেই। অথচ একদিন ছিল যখন কত বিবি আমার জন্যে দিওয়ানা হয়ে যেতো। আমার গরীবখানার নাম ছিল খুশ জাহান। তে-মঞ্জিলা ইমারত, আগা-গোড়া পাথরের তৈরী। চারদিকে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা আমার খুশ জাহান। সামনের দিক দিয়ে ঢুকবার একটিমাত্র ফটক, তার লোহার দরোজা বন্ধ করে দিলে বাইরে থেকে ঢুকবার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল।

"পেছন দিকে একটা খিড়কি দরজা ছিল লম্বা সুড়ঙ্গের শেষে। ঐ দরজা খুলে বেরোলেই নদী। ঐ সুড়ঙ্গ আর ঐ গোপন দরজার কথা জানা ছিল শুধু আমার, আর জানতো আলিবাবা।

"আমার দিল ছিলো পিয়ার আর মুহব্বতে ভরা—যাকে আপনারা মিনমিনে জবানিতে বলেন প্রেম। আপনারা একনিষ্ঠ প্রেম বলেন তাকে যা একজনকে বরাবর আঁকড়ে ধরে থাকে। কিন্তু আমি বলি পিয়ারই বলুন আর মুহব্বতই বলুন তা হচ্ছে নদীর স্রোতের মতো—এক জায়গায় জমে থাকলেই তাতে শ্যাওলা জমে যাবে।

"আমার হারেমে ছিলো পঁচিশখানা আলাদা মহল—এক এক মহলে এক এক বেগম আর তার বাঁদী থাকতো। হারেমের মহলগুলোর নম্বর ছিল এক থেকে পঁচিশ—আর বেগমরাও তেমনি ছিল এক নম্বরী বেগম, দু' নম্বরী বেগম···এমনি করে পঁচিশ নম্বরী বেগম পর্যন্ত। মহলের নম্বর মাফিক সেই মহল-ওয়ালী বেগমের নম্বর হত। হারেমের খোজা ছিল আবদাল্লার ছেলে আলিবাবা। এ সেই দু-কুড়ি দস্যুর আলিবাবা নয়—এ আলাদা। ভারী ইমানদার—যাকে আপনারা বলেন বিশ্বাসী। আর চালাক! ভারী চালাক ছিল। আমার আর পুরো কথা কইবার দরকার হত না—শুধু ইশারা থেকেই সব বুঝে নিত আলিবাবা।

"আমার হারেমের সুন্দরীরা ছিল বেহেস্তের হুরীদের চাইতেও খুবসুরত। তাদের প্রত্যেক মহলে ছিল আলাদা গোসলখানা, তাতে ছিল গোলাপজলের চৌবাচ্চা, আতরের ঝরনা, মিশরী সাবান, ইস্পাহানের খুশ-বু-ওয়ালা তেল, তুর্কী তোয়ালে, চীনা চপ্পল, ঢাকাই মস্‌লীনের ওড়না, ইরানী ধুপ, বস্‌রাই ফুলদানী। গোসলখানার পাশেই ছিল নাশ্‌তা-ঘর; তাতে হরেক রকমের নিত্যি নতুন টাট্‌কা ফল সাজানো থাকতো—নাশ্‌পাতি, আপেল, বেদানা, পেস্তা, আখ্‌রোট, আনার, আনারস, আঙ্গুর আরো রকমারি মরসুমী আর হরদমী ফল।

'বিবিদের বিছানা ছিল দামী মখ্‌মলের। বিছানার ওপরে—অনেক ওপরের ছাত আগাগোড়া আস্‌মানী নীল দিয়ে রং করা, যেন ওপরে তাকালে মনে হয় খোলা ছাতে শুয়ে আস্‌মানের দিকে তাকিয়ে আছি। মশারির কোনো দরকার হতো না—আমার হারেমে কোনো হারামজাদা মশা মাথা গলাতে সাহস পেত না।

"হারেমের প্রত্যেক বিবির জন্যে একটি করে বীণা থাকত। বিবিরা কেউ বড় একটা বাজাতো না, বাজাতে জানতোও না। বাজাত হারেমের বাঁদীরা। পঁচিশ মহলের পঁচিশটা বাঁদীকে ওস্তাদ রেখে বীণা বাজনার তালিম নিইয়েছিলাম। বাঁদীরা বীণ্‌ বাজাতো। মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে তবলা সঙ্গত করতো আলিবাবা—আমার হারেমের খোজা। ঘন ঘন তাল কেটে ফেলতো বটে, কিন্তু তবলাটা তবু বাজাতো ভালো আলিবাবা। বেড়ে আস্তে আস্তে সইয়ে সইয়ে বাজাতো, কানকে জ্বালাতন করতো না।

"গোটা কয়েক বিবিকে গান গাইতে শিখিয়েছিলাম এক গাইয়ে বাঈজী রেখে। সে গজল আর ঠুংরী গান শেখাতো। যে মহলের বিবি গাইতে পারতো না, সে মহলের বাঁদী গান শোনাতো বীণ্‌ বাজিয়ে, কখনো বা না বাজিয়ে।

একবার এক হাওয়া-ফুরফুরে রাত্তিরে আসমানে চাঁদের রোশ্‌নী জ্বলছে, আর অনেক দূরে না জানি কোন মিঞা বাজাচ্ছে সানাই। আমি ওমর খৈয়ামের মতো আমার হারেমের এক মহলের চিলে কোঠায় আঙুরী নেশায় মশগুল হয়ে বসে আছি, আর আমার পাশে মৌন ভেঙে গুলবদন বিবি তার নিজের গান বাঁদীকে দিয়ে গাওয়াচ্ছে। সানাই বাজনা একটু জোর ধরতেই দেখি গুলবদন বিবির মন ঐ দিকে পড়ে আছে। বাঁদী কি গাইছে শুনছে না বিবি। ব্যাস, অমনি আমার মাথায় খুন চড়ে গেল। সে রাতটা চেপে গেলুম। পরদিন সানাই-বাজিয়ের তল্লাস করিয়ে জানলুম সে আমারি এক তালুকদারের

বড়ো ছেলে। তাকে ডাকিয়ে এনে কতল্ করে গুম করে ফেললুম আমার গুম্‌খানায়। আমার হারেমের পেছনেই গুম্‌খানা, তার খোঁজ জানতুম শুধু আমি, আর জানত আলিবাবা। তারপর আলিবাবাকে বললুম এবারে গুলবদন বিবিকে কতল্ করতে হবে। আলিবাবা বললে যো হুকুম জাঁহাপনা, কিন্তু আজকাল বিবিদের বাজার সুবিধের নয়—এক বিবি গেলে তার জায়গায় নতুন বিবি পাওয়া শক্ত। আমি বললুম, কেন? আলিবাবা বললে লড়াই লেগেছে, তাই সব কিছুরই এখন কালোবাজার।

"আমি বললুম তা হোক, না হয় হারেমে চব্বিশ বিবি থাকবে। তুমি কতল্ করে গুমখানায় গুম করে দাও, আর না হয় তো সুড়ঙ্গের রাস্তায় খিড়কি দুয়োর দিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দাও।

'তাই করে আলিবাবা বললে তাই করেছি জাঁহাপনা। শুনে খুশী হয়ে আলিকে ইনাম দিলুম একখানা পাকা সোনার আংটি।"

আমি বললাম "তৈরী করিয়ে দিলেন?"

নবাব উজবেক আলি খাঁ বললেন, "না, আমার নিজের তিন শো সাতান্নখানা আংটি থেকে একখানা দিলুম। তারপর তখন আমার হারেমে বাকী রইলো চব্বিশ বিবি। আপনি শুনলে হয়তো বিশ্বাস করবেন না। এর পর আস্তে আস্তে আমার হারেম থেকে একজন একজন করে বিবি কমতে লাগলো। মানে, আমিই কমাতে লাগলুম।"

"কতল্ করিয়ে?"

"হ্যাঁ, কতল্ করিয়ে। বেইমানকে আমি কোনো মেহেরবাণী দেখাতে রাজী নই। তা সে মরদই হোক বা জেনানাই হোক। নবাব উজবেক আলি খাঁর কলিজায় যে চোট পৌঁছাবে বেইমানী করে, তার কোনো মাফ্ নেই।"

"তারপর?"

"তারপর এক এক করে হারেমের আস্‌মান থেকে একটা একটা

করে সিতারার জৌলুষ কমে যেতে লাগলো। দিলআরার মানে জানেন না? আপনারা যাকে তারা বলেন। আমার পঁচিশ-বেগমী হারেমের বেগম কমতে কমতে এক বেগমে গিয়ে ঠেকলো—তার নাম গুলনেয়ার বেগম। কেমন, দিলচস্পী নাম কি না? দিলচস্পী মানে বুঝলেন না? দিলের দোলনায় দোলা লাগানো।"

"মানে দিল্ দোলানো নাম আর কি। তা তো নিশ্চয়ই। অদ্ভুত সুন্দরী ছিলেন নিশ্চয়ই?"

"খুবসুরত। খুবসুরত। আমি তাই তার আরেক নাম দিয়েছিলাম জন্নৎ-উন্নিসা। তারপর শুনুন। দিন যায়। রাত যায়। এক নবাব আর এক বেগম। পঁচিশ মহলা হারেমের চব্বিশ মহল খাঁ খাঁ করে, বেগম নেই, বাঁদীগুলোর পোয়াবারো। তারা গান গায়, বীণ্ বাজায়। পেয়ালার পর পেয়ালা সিরাজী সাবাড় করে।........."

আমি বললাম "বাঁদীগুলোকেই বেগম করে নিলেন না কেন নবাব সাহেব?"

নবাব উজবেক্ আলি খাঁ বললেন "একবার তাই ভেবেছিলুম। কিন্তু আলিবাবার জন্যে তা আর হয়ে উঠলো না। সব ভণ্ডুল করে দিলে সে। কেন বুঝলেন তো? বেগম যত কম থাকবে তার খাটুনিও তত কম। এক বেগম থাকলে শুধু তাকে পাহারা দিলেই হবে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু সেই একটি বেগমও বাকী রইল না।"

"কোথায় গেল?"

"কতল্ করালুম। বেগমের কাছে একটা চিঠি পেলো আলিবাবা। ভয়ানক চিঠি। আলিবাবা বললে এমন ভয়ানক চিঠি, যে আমাকে কিছুতেই দেখানো চলে না। শুনে মগজে খুন চড়ে গেল। বললুম কতল্ করে গুম্ করে ফেল। যো হুকুম বলে আলিবাবা চলে গেল। আমি পস্তাতে লাগলুম, আফসোসে মরে যেতে লাগলুম। শেষ বেগমও কতল্ হয়ে গেলে আমার হারেমের আর রইলো কি? কিন্তু নবাব

উজবেক্ আলি খাঁ যে হুকুম একবার ভুল করেও দিয়ে ফেলে তা আর ফেরত নেয় না। জান্ যায় সো ভি আচ্ছা, তবু জবানের খেলাপ্ হবে না। কলিজা খান্ খান্ হয়ে গেল, চোখের পানিতে ভজন ভজন রুমাল ভিজে ভিজে গামছা হয়ে গেল। তা হয়ে গেল তো হয়ে গেল, তবু মুখ থেকে একটা কাঁদুনি জবান নিকলালো না।'

"তারপর ?"

"আলিবাবা এসে বললে হুকুম তামিল হয়েছে। গুলনেয়ার বেগম ওরফে জন্নৎ-উন্নেসা আর ফিরে আসবে না। এখন রইল শুধু পাঁচিশ বাঁদী, বেগম একটিও নয়। যা ছিল হারেম তা হয়ে গেল বাঁদী-মহল। নবাব উজবেক্ আলি খাঁ-র গুলিস্তাঁ হয়ে গেল রেগিস্তাঁ—আপনাদের গিরিশ ঘোষের ভাষায়, সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল। বিলকুল শুকিয়ে গেল।"

"তারপর ?"

আমার প্রশ্ন শুনে বিষম ক্ষেপে উঠে নবাব উজবেক্ আলি খাঁ চিৎকার করে উঠলেন "আমার পাঁচিশ-বেগমী হারেম বাঁদী-মহল হয়ে গেল, গুলিস্তাঁ রেগিস্তাঁ হয়ে গেল, সাজানো বাগান শুকিয়ে ঝরঝরে হয়ে গেল, এর পরও কিনা বলছেন তারপর ? নিকালো, আভি নিকালো ইহাঁসে। বেওকুফ, বেতমিজ, কমবখ্ত্.........."

বেগতিক দেখে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে ছুট দিলাম নবাব সাহেবের ঘর থেকে। বারাণ্ডায় বেরিয়েই যার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে থমকে দাঁড়ালাম তিনি ঠিক পাশের ঘর থেকেই বেরোচ্ছিলেন।

তিনি হেসে বললেন "নবাব সাহেবের তাড়া খেয়েছেন বুঝি ? ভয় নেই। উনি তাড়া দেন, কিন্তু তাড়া করেন না। ওঁর হারেমের কাহিনী শুনেছেন কি ?"

"শুনেছি।"

"পাঁচিশ বেগমের কতল্ আর গুমের কাহিনী ?"

"ঠিক তাই।"

"তাহলে আসল কথাটা শুনুন। একটি বেগমকেও কতল করিনি, তবে এক হিসেবে গুম করেছি বলতে পারেন। মানে বাইরে পার করে দিয়েছি। আমিই আলিবাবা।"

"নবাব উজবেক্ আলি খাঁ-র হারেমের খোজা?"

হো হো করে হেসে উঠলো আলিবাবা। বললে "খাজা নবাব চন্দোর খোজা বলেই আমাকে জানতো বটে। আচ্ছা, আপনি এখন আসুন। কিন্তু খবরদার, নবাবকে যেন এবিষয়ে কিছু বলবেন না। যা আপনাকে দিলাম আসল খবর, তা যেন কখনো দু'কান না হয়। সালাম।"

বলে আলিবাবা তার ঘরে ঢুকে গেল। ত্রিলোচন ত্রিপাঠীর সঙ্গে দেখা করলুম। তিনি বললেন "এরা দুজন এ আশ্রমে নতুন ভর্তি হয়েছেন। নবাব উজবেক্ আলি খাঁ-র নাম হচ্ছে ভবসাগর চৌধুরী, আর আলিবাবার নাম দিগম্বর পাকড়াশী। চৌধুরী বড়লোকের ছেলে, কাপ্তানী করে পয়সা উড়িয়েছে। আর পাকড়াশী তার মোসাহেব ইয়ার, তার কাপ্তানী কারবারের প্রাইভেট সেক্রেটারী। মারাত্মক বা বদ্ধ পাগল নয়, খেয়ালী পাগল বলতে পারেন। একজন ভাবেন উনি নবাব উজবেক্ আলি খাঁ, আরেকজন ভাবেন তিনি আলিবাবা। শুনতে পেলাম থর থর বেসুরো গলায় নবাব উজবেক্ আলি খাঁ গাইছে সিনেমা সঙ্গীতের ভঙ্গীতে :

"হায়্ মেরা দিল্ টুট্ গয়া হায়, টুট্ গয়া।"

ভোলা যাবে না শকুন্তলা স্যানাটোরিআমের ভজগোবিন্দ ভোজালীকেও। তাঁকে মাত্র আট আনা ধার দিয়ে তাঁর মুখ থেকে যে ভাষণ শুনেছিলাম তাই তার নিজের ভাষায় হুবহু তুলে রাখছি

আমার এই ডায়েরি খাতায়।

দশটা টাকা ধার দেবেন দাদা?......পাঁচ টাকা?......তিন টাকা? ......ছু' টাকা?......এক টাকা?......মাত্র আট আনা আছে বলছেন? তাই দিন। বাঁচালেন। বড্ড দরকার ছিল।

কিন্তু ধার দিলে আর শোধ পাবেন না টের পেলেন কি করে? আমি যে পাগল নই এও ধরে ফেলেছেন নাকি? কথাটা ফাঁস করবেন না দাদা, তাহলে আর এখানে থাকতে দেবে না। এ জায়গা শুধু পাগলদের জন্যে কিনা।

অবিশ্যি যে অত্যাচার চলেছে তাতে আর কেউ হলে অ্যাদ্দিনে নির্ঘাত পাগল হয়ে যেতো।...আজ্ঞে না, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, ডাক্তার, নার্স, বেয়ারা, এদের সবাইকে বরং আমিই ধমকে ঠিক রাখি। অত্যাচার করছেন আমার পূর্ব পুরুষেরা। এক বছর ধরে অত্যেচার চলেছে, ফি হপ্তায় এক পুরুষ করে বাড়ছে। ফি শনিবারে সারা রাত আমায় যে কি হেনস্থা সইতে হয় দাদা, সে আর কহতব্য নয়......।

তা হলে গোড়া থেকেই বলি শুনুন। আমার নাম ভজগোবিন্দ ভোজালী, আমার ছেলের নাম পরমানন্দ ভোজালী, নাতির নাম গজানন ভোজালী, বাবার নাম যজ্ঞেশ্বর ভোজালী, ঠাকুর্দার নাম কৈলাস ভোজালী, ঠাকুর্দার বাবার নাম—কিন্তু এত নাম আপনি মনে রাখতে পারবেন না দাদা। শুধু জেনে রাখুন, আমাদের এই ভোজালী বংশ অতি প্রাচীন, অতি ধার্মিক বংশ, এ বংশের কুলধর্ম হচ্ছে একতরফা ধার নেয়া। আমাদের এক পুরুষ, দুই পুরুষ, তিন পুরুষ করে যত খুশি পেছন দিকে চলে যান, কোনো পুরুষে এমন কাউকে পাবেন না যিনি ধার করেননি, বা ধার করে সে ধারের একটি আধলাও শোধ দিয়েছেন। আমরা মদ ছুঁই নে, গাঁজা-ভাঙের ছায়া মাড়াই নে, পান, তামাক, নস্যি, আপিং, বিড়ি, সিগ্রেট আমাদের ত্রিসীমানায় দেখতে পাবেন না, কিন্তু আমরা প্রত্যেকটি ভোজালী জন্মাই রক্তে ধারের নেশা নিয়ে। ভোজালী বংশে

না জন্মালে আপনি এ নেশার ঝোঁক আন্দাজ করতে পারবেন না দাদা।

ধার নিয়ে ধার শোধ দেওয়া আমাদের কোনো পুরুষের কোষ্ঠীতে লেখেনি। তেমনি ধার আদায় করবার অসাধারণ প্রতিভাও আমাদের বংশগত। দেখলেন তো কি অনায়াসে আপনার কাছ থেকে আট আনা ধার নিলাম? অথচ আপনার সঙ্গে ক' মিনিটের পরিচয়? আমার বড় ছেলে পরমানন্দ ভোজালী হাজার পাঁচেক টাকা ধার কুড়িয়ে সুদে খাটাচ্ছে। একটি পাই পয়সাও শোধ দেবে না; তেমন বাপের ব্যাটাই নয় পরমানন্দ......। হ্যাঁ, পাওনাদারেরা তাগিদ দিতে আসে বই কি। কিন্তু রবি ঠাকুরের ঐ গানখানা শুনেছেন তো—'সে আসে ধীরে, যায় লাজে ফিরে?' পাওনার তাগিদ দিতে এসে পাওনাদারেরা লজ্জা পেয়ে ফিরে যায়, এমনি অমায়িক বিগলিত বচনের ভেলকিতে তাদের একেবারে জল করে ছেড়ে দেয় পরমানন্দ। এই যে অমায়িক বচনের বিগলিত ভেলকি, এই যে জল করে ছেড়ে দেওয়া, এও জানবেন ভোজালী বংশের বিশিষ্ট ধারা। এ জাদু মিশে আছে প্রত্যেক ভোজালীর রক্তে। এই যে আপনি আট আনা ধার দিলেন, শোধ নেবার জন্যে তেড়ে এসে দেখুন একবার; এমন জল করে ছেড়ে দেবো আপনাকে, উল্‌টে আরো আট আনা দিয়ে যেতে ইচ্ছে করবে আপনার।

পরমানন্দ ভোজালীর বড় ছেলে গজানন ভোজালী বাপ্‌কা ব্যাটা, ঠাকুর্দাকা নাতি। ভারী ধীরস্থির প্রকৃতির, ছট্‌ফটানি একদম নেই, ছ' বছর ধরে কলেজের সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাসে পড়ছে, কলেজের প্রিন্সিপাল থেকে শুরু করে প্রফেসর আর বেয়ারা পর্যন্ত সবাই গজাননকে এক ডাকে চেনে। গজানন এখন দুশো সাতান্ন টাকা ধারে। ওর বয়সে ওর বাবা, মানে পরমানন্দ, আরো বেশি ধারত। পরমানন্দকে বলে-ছিলাম মন খারাপ কোরো না পরম। টাকার বাজার আগেকার চাইতে ঢের বেশি টাইট হয়ে গেছে, এইটে ভুলে যেয়ো না। তাছাড়া অ্যায়সা দিন নেহি রহেগা।। স্লো বাট শিওর উইন্‌স দি রেস। দেখবে এই

গজাননই একদিন ধারের পাল্লায় তোমায় আমায় খোকা বানিয়ে দেবে। ভোজালী বংশের পবিত্র ধারা মার খাবে না গজাননের হাতে।'

এবারে আমার কথা বলি। আমার ধার সর্বসাকুল্যে চার হাজার তিনশো পঁচানব্বই। এ অবিশ্যি শুধু আসল, সুদ ধরিনি। শোধ যখন করব না তখন আর সুদের হিসেব করা কেন? আসল দেনা চার হাজার তিনশো পঁচানব্বই, আর পাওনাদার সর্বসাকুল্যে তেতাল্লিশ জন; তা থেকে দুজন গঙ্গা পেয়েছেন, তাহলে ধরুন নীট একচল্লিশ জন। এদের অনেক বছর ভাঁড়িয়ে ভাঁড়িয়ে রেখেছিলাম, তারপর সতেরো জন পাওনাদার ভারি ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করলে, আর তাই দেখে বাকি চব্বিশজনও ধরলে ঐ মহাজনী পন্থা। আমি তাদের বার বার নানা কায়দার মিঠে কথা বলে ফেরাতে লাগলাম। কিন্তু ফেরালে হবে কি? তারা বার বার ফিরে গিয়ে আবার বার বার ফিরে ফিরে আসতে লাগল, যেন সমুদ্দুরের নাছোড়বান্দা ঢেউয়ের দল। ক্রমে ক্রমে আমি ক্ষেপে উঠতে লাগলাম।

হাজার হোক; মানুষের সইবার একটা সীমা আছে তো? হলামই বা ভোজালী। তাছাড়া, তাগিদ যত মিঠে, যত মোলায়েমই হোক না কেন, তবু সে তাগিদ। সোনার চাবুকের মার কিছু সোনালী নয়। ওদের ভেতরে আবার সবচেয়ে জাহাঁবাজ শয়তান হলো গিয়ে হরিধন পতিতুণ্ডি। মেয়ের বিয়ে, বৌমার ব্যামো, বীমার প্রিমিয়াম, অমুকের তমুক, তমুকের অমুক, হ্যানো-ত্যানো এক গাদা অজুহাত শুনিয়ে শুনিয়ে কান ঝালা-পালা করতে লাগল, যেন আমার কাছ থেকে ঐ একশো সাড়ে তিন টাকা পাচ্ছে না বলেই ওর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু আটকে রয়েছে। শেষটায় জ্বালাতন হয়ে একবার ভাবলাম দুত্তোর, দিই হরির কিছু টাকা শোধ করে। অমনি শিরায় শিরায় শিউরে উঠে আমার ভোজালী রক্ত সিংহনাদে বলে উঠল 'ধিক!' আর সুবুদ্ধি হুঁশিয়ারী দিয়ে বললে 'সর্বনাশ, একবার দুর্বলতা দেখালে

সবগুলো পাওনাদার এসে জোঁকের মত চেঁকে ধরবে, তখন সামলাতে পারবিনে।”

দিলাম না, একটি আধলা দিলাম না হরিধনকে। এক গাল মিষ্টি অমায়িক হাসি হেসে এক গাদা পালটা অজুহাত শুনিয়ে তাকে বিদেয় করলাম। আর একসঙ্গে রাম চটা চটে উঠলাম সবগুলো পাওনাদারের ওপর। হতভাগারা বোঝে না কেন একটি আধলাও আমার হাত দিয়ে গলবে না? আর তাই বুঝে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে না কেন? ওদের জ্বালায় কি বাকি জীবনটা একটু স্বস্তিতেও কাটাতে পারব না?

ওদের অপরাধে—বুঝলেন দাদা?—গোটা মানুষ জাতটার ওপরই ঘেন্না ধরে গেল। সেটা ভালো কথা নয় বুঝতে পারছি, কিন্তু হাজার হোক আমি মানুষ তো? গণ্ডার নই। জমা টাকা ভেঙ্গে তো আর ধার শুধতে পারিনে? কথায় বলে বসে খেলে আর ঘরের টাকা ভেঙ্গে ধার শুধলে রাজার ভাণ্ডারও ফুরিয়ে যায়।

চটে-মটে সাতান্ন টাকা ধার করে এক শনিবার বিকেলে সোজা চলে গেলাম রেসের ময়দানে। তার আগে কালীঘাটে গিয়ে মাকে পেন্নাম করে বলে গেলাম 'আজকের রেসের বাজীতে এক গাদা টাকা পাইয়ে দাও মা। চাঁদির জুতো মেরে পাওনাদারী মুখগুলো কিছুদিনের জন্যে বন্ধ করি।'

কিন্তু দাদা, ঐ করেই সর্বনাশ করলাম, মাকে চটিয়ে দিলাম। রেসের ময়দান থেকে ফিরলাম সাতান্ন টাকাই গচ্চা দিয়ে। শুধু কি তাই? মাকে চটানোর জের অত সহজে মিটবার নয়। বাড়ি ফিরে যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখি বাড়ি নয়, হাসপাতালের বিছানা। গায়ে মাথায় ব্যাণ্ডেজ। কদিন পরে ব্যাণ্ডেজ খোলা হল তার হিসেব জানি নে। মনে হলো মগজের ভেতর যেন কি সব ওলট-পালট হয়ে গেছে, দিব্য চোখ আর দিব্য কান খুলে যাচ্ছে হঠাৎ হঠাৎ যখন-

তখন। একদিন জন সাতেক পাওনাদার এলো দল বেঁধে আমায় দেখতে, বোধকরি ভয় পেয়েছিল আমি গঙ্গা পেয়ে ওদের পাওনা ঠকাব। তারা অমায়িক হেসে মুখে বললে 'এখন কেমন আছেন ভোজালী মশাই?' কিন্তু আমি পরিষ্কার জলের মতো শুনতে পেলাম, ওরা সব ক'টায় মনের ভেতর একসঙ্গে কোরাসে চেঁচাচ্ছে :

'শালা একটি আধলাও শোধ না দিয়ে টেঁসবার মতলব আঁটছে।

'শালা একটি আধলাও শোধ না দিয়ে টেঁসবার মতলব আঁটছে।'

'শালা একটি আধলাও শোধ না দিয়ে টেঁসবার মতলব আঁটছে।'

'শালা.........'

আমি সব সইতে পারি দাদা, কিন্তু মুখের ওপর কেউ শালা গাল দিয়ে যাবে তা সইতে পারি নে। বার বার ওদের কোরাসের শালা শুনে ক্ষেপে উঠে একা অভিমন্যুর মতো ঐ সপ্তরথীকে ছাতা পেটা করে তাড়ালাম। হাঁ-হাঁ করে আমাকে সামলাতে এসেছিল পরমানন্দ, তাকে তুই ধমকে ঠাণ্ডা বানিয়ে দিলাম। ছোঁড়া মুখে কিছু বললে না, কিন্তু পরিষ্কার শুনতে পেলাম মনে মনে বলছে 'বুড়োর হাতে পায়ে ডাণ্ডা বেড়ি লাগাতে হবে দেখছি।' শুনে রেগে চিৎকার করে বললাম 'তোর বাপের সাধ্যি কি আমায় ডাণ্ডা বেড়ি পরাবে। নিকালো। আভি নিকালো হিয়াঁসে।' বাপের তিরিক্ষি মেজাজ দেখে ভয়ে ভয়ে তখনকার মতো কেটে পড়ল পরমানন্দ। পাড়ায় পাড়ায় রটে গেল গাড়ির ধাক্কা খেয়ে মগজ নড়ে গিয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছে ভজগোবিন্দ ভোজালীর। দেখুন একবার কাণ্ড। দিব্যজ্ঞান খুলে যাওয়ার ঝকমারিটা বিবেচনা করুন একবার।

অশান্তিও বাড়ল। বৌমাকে ভাবতাম আমাকে শ্বশুর বলে একটু ভক্তিছেদ্দা করে। এখন দিব্য কানে হঠাৎ একদিন শুনলাম সে মনে মনে বলছে 'এবারে বুড়োটা গঙ্গা পেলে হাড় জুড়োয়।' বৌমা মেয়েমানুষ না হলে, মা কালীর দিব্যি বলছি আপনাকে, সেদিন ওকে

ছাতা-পেটা করে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতাম।

কিন্তু—ঐ যে বোষ্টমরা বলে—'এহ বাহ্য'। আসল জ্বালার কথা এইবার শুনুন। মানে—ঐ যে গোড়াতে বলেছিলাম—পূর্ব-পুরুষদের উৎপাত। শুরু হলো পিতৃদেবকে দিয়ে—মানে ৺যজ্ঞেশ্বর ভোজালী। বাবা হাজির হলেন শনিবারের রাত্তিরে। খেয়ে দেয়ে বিছানা নেবার আগে একটু জিরিয়ে নিচ্ছি, তখন।

বাবা বললেন 'বাবা ভজগোবিন্দ, পরলোকে এসে অবধি একটি আধ্‌লা ধার করতে না পেরে নিদারুণ জ্বালায় জ্বলছি। আমায় বাঁচাও এ জ্বালা থেকে।'

আমি বললাম 'কেন বাবা? তোমাদের ওখানে কি ধার দেবার লোক নেই?'

বাবা বললেন 'আছে, কিন্তু ওপারের দেনা পুরো মেটানো না থাকলে এপারে একটি আধ্‌লাও ধার পাবার উপায় নেই। বড্ড কড়াকড়ি। তুমি ভোজালী বংশের ছেলে, বিনা ধারে থাকা যে কি দুঃসহ তাতো তোমার অজানা নয় বাবা। সুদে-আসলে আমার ঋণ এক হাজার তিনশো একান্ন টাকা আশী নয়া পয়সা। এ ক'টা টাকা তুমি শোধ করে দাও, আমার এধারে ধার পাবার পথ পরিষ্কার হোক। বাঁচাও, বাঁচাও তুমি আমাকে, ধার না করে থাকার এই অসহ্য যন্ত্রণা থেকে।'

বললে আপনি হয় তো বিশ্বাস করবেন না দাদা, পিতৃদেবের কথা শুনে আমি ব্যথিত, বিস্মিত, পুলকিত, চমকিত হলাম। ভোজালীর রক্তে মেশা ধারের নেশা ওপারে গিয়েও ঝাণ্ডা নিচু করে না, তেমনি জোরালো থাকে!!!

বললাম 'কিন্তু ধার শোধ করা কি ভোজালী বংশের পবিত্র ঐতিহ্যের বিরোধী হবে না বাবা? এ কলঙ্ক মাথায় নিয়ে ভোজালী বংশের প্রথম কুলাঙ্গার হতে বলছ তুমি আমাকে?'

বাবা বললেন 'বৎস, পিতৃঋণ শোধে দোষ নেই, বিশেষ করে যখন

আমার যে পরিমাণ ঋণ তুমি ওধারে শোধ করবে, তার বেশি পরিমাণ ঋণ আমি এধারে গ্রহণ করে কোনো দিন শোধ দেবো না।'

আমি বললাম 'কিন্তু ঘরের টাকা ভেঙে পিতৃঋণ শোধ করাটাও কি উচিত হবে বাবা?'

বাবা বললেন 'না। মহামতি চার্বাক বলে গেছেন ঋণ করে ঘি খেতে। তুমি ঋণ করে আমার ঋণ শোধ করতে পারবে না?'

'কিন্তু তারপর আমার ঋণ?'

'তোমার ঋণ যথাকালে শোধ করবে তোমার পুত্র পরমানন্দ। পরমানন্দের ঋণ শুধবে পরমানন্দের পুত্র গজানন। এইভাবে ভোজালী বংশে ধার শোধের ধারা বয়ে চলবে পুরুষানুক্রমে, পূর্ব-পুরুষ থেকে পরপুরুষে।'

বাবার অনুরোধ উপরোধ আর শাসানি শেষ পর্যন্ত এড়াতে পারলাম না। এক দুর্বল মুহূর্তে বলে ফেললাম 'তোমার ঋণ শোধের ভার আমি গ্রহণ করলাম বাবা। কিন্তু আমাকে সময় দিতে হবে। মনে রেখো, রোম নগরী একদিনে নির্মিত হয় নাই।'

'তুমি আমার ঋণভার গ্রহণ করলে, আমি নিশ্চিন্ত হলাম বাবা ভজগোবিন্দ।' বলে বাবা নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেলেন। বাবাকে বচন দিয়ে যে কি বিষম বিষবৃক্ষ রোপণ করলাম, তখন তার আভাষ মাত্র টের পাইনি।

খানিকটা আভাষ পেলাম তার পরের শনিবার রাতে। সে রাতে আবির্ভাব হলো ঠাকুর্দা কৈলাস ভোজালীর। ঠাকুর্দা বললেন 'বৎস ভজগোবিন্দ, তুমি পিতৃঋণ শোধে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছ, এতে আমি প্রীত হয়ে আশীর্বাদ করতে এসেছি।'

আমি বললাম 'করুন।'

আশীর্বাদ করে ঠাকুর্দা তাঁর নিজের শোধ না করে যাওয়া ধারের যে ফিরিস্তি দিলেন, সুদে-আসলে তা মোটের ওপর দাঁড়ায় সতেরো শো

টাকা। ঠাকুর্দা বললেন 'এ ঋণ তোমার বাবারই শোধ করে আসবার কথা ছিল। সুতরাং এও তোমার পিতৃঋণ।'

প্রাণপণে এড়াতে চাইলাম, পারলাম না এড়াতে। ঠাকুর্দা বললেন 'তোমার বাবা তো এই সেদিন এলো। আমি তার অনেক আগে থেকে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছি। আমার ওপারের ঋণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত এপারে একটি আধলা ধার পাবো না আমি। এ যন্ত্রণা থেকে আমায় বাঁচিয়ে উপযুক্ত নাতির কাজ করো ভজগোবিন্দ। যজ্ঞেশ্বর তোমার বাবা। আমি তোমার বাবার বাবা। বাবার জন্যে বাবার বাবাকে ভুললে চলবে না। সাবধান, ভজগোবিন্দ।'

ধমকানিতে ঘাবড়েই বলুন, সমব্যথায় গলেই বলুন, অথবা কর্তব্যের ধাক্কা খেয়েই বলুন, ভেবে দেখলাম সত্যিই বাবার চাইতে বেশি দিন ধরে কষ্ট পাচ্ছেন তিনি। কথা দিলাম বাবার ঋণ শুধলে সেই সঙ্গে ঠাকুর্দার ঋণও শুধে দেবো।

তখনো টের পাইনি কি সর্বনাশের চোরাবালিতে পা দিলাম। এর পরের শনিবার মাঝ রাতে এক বুড়ো এসে হাজির আমার একলা ঘরে।

শুধালেম 'কে আপনি?'

'আমি তোমার ঠাকুর্দার বাবা রামকানাই ভোজালী।'

বুঝলাম ইনিও এর ইহলোকের ঋণের বোঝা আমার ঘাড়ে চাপাতে এসেছেন। বললাম, 'তার প্রমাণ? আমি আপনাকে দেখিনি, আপনার ছবিও নয়।'

৺রামকানাই ভোজালী হাঁকলেন 'কৈলেস!'

সঙ্গে সঙ্গে ভোজবাজীর মতো কোথা থেকে এসে হাজির ঠাকুর্দা কৈলাস ভোজালী। রামকানাই বললেন 'আমি তোর বাপ কিনা?' ঠাকুর্দা বললেন 'আজ্ঞে।'

ঠাকুর্দার বাবা আবার হাঁকলেন 'যজ্ঞেশ্বর কোথা গেলি রে? জগু?'

সঙ্গে সঙ্গে আমার বাবা, অর্থাৎ যজ্ঞেশ্বর ওরফে জগু এসে হাজির।

রামকানাই ভোজালী বললেন 'আমি তোর কে হই?'

বাবা বললেন 'আজ্ঞে, ঠাকুর্দা।'

'এবার তোমরা চলে যেতে পারো।' বললেন ঠাকুর্দার বাবা। চলে গিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন ঠাকুর্দা আর বাবা। ঠাকুর্দার বাবা বললেন 'তোমার ঠাকুর্দা যদ্দিন বেঁচে ছিল, ভেবেছিলাম আমার ধারগুলো সব শুধে আসবে। একটি আধলাও সে শুধে এলো না। ওদিকে চক্রবৃদ্ধি সুদে আমার দেনা বাড়ছে, এদিকে সেই সঙ্গে আমার যন্ত্রণাও বাড়ছে, চক্রবৃদ্ধি হারে গ্যালপিং থাইসিসের মতো। ওপারের দেনা সুদে-আসলে শোধ না হওয়া পর্যন্ত এপারে একটি আধলা ধার মিলবে না। ও-ও-ও-ও-ওফ্!!!' বলে এমন মর্মভেদী আর্তনাদ করলেন আমার ঠাকুর্দার বাবা, যে মনে হলো তার ধাক্কায় আমার বুক ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত ঠাকুর্দার বাবার ঋণের দায়টাও নিতে হলো। ওঁর ঋণ চক্রবৃদ্ধি সুদে বেড়ে তখন হয়েছে আড়াই হাজার টাকা। মূল পাওনাদারেরা তখন আর ইহলোকে নেই, তাদের বর্তমান বংশধরদের নাম ঠিকানা আর আলাদা পাওনার হিসেব বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন রামকানাই ভোজালী। পুরো তিন পুরুষের ঋণের বোঝা মাথায় চাপল সুদে-আসলে। তারপর পুরো এক হপ্তা ভয়ে ভয়ে কাটালাম। শনিবারটা যতই এগিয়ে আসে ততই শিউরে উঠি। তবু শনিবার এলো। এলো রাত্তির। এবারে যিনি এলেন তাঁর বয়স ঠাকুর্দার বাবার চাইতে অনেক কম মনে হল। তিনি বললেন, 'আমি হচ্ছি দিগম্বর ভোজালী, রামকানাইর বাবা, তোমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা। তুমি হলে আমার নাতির নাতি। রামকানাইর চাইতে আমি অনেক কম বয়সে মারা গিয়েছিলাম, তাই আমার চেহারা রামকানাইর চাইতে কাঁচা দেখছ। প্রমাণ চাও তো বলো রামকানাইকে ডাকি।'

আমি বললাম 'দরকার নেই।' ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা যেন হিপনোটাইজ করে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে গেলেন তাঁর সুদে আসলে সাড়ে তিন হাজার টাকা ঋণের বোঝা, আর পাওনাদারদের সর্বশেষ বংশধরদের ফর্দ।

পরের শনিবার এলেন দিগম্বর ভোজালীর বাবা পীতাম্বর ভোজালী। তারপরের শনিবার পীতাম্বর ভোজালীর বাবা ব্যোমকেশ ভোজালী। তারপরের শনিবার ব্যোমকেশ ভোজালীর বাবা জগবন্ধু ভোজালী। পুরুষের পর পুরুষের চক্র-বাড়তি ঋণের বোঝা হপ্তার পর হপ্তা চাপতে লাগল আমার ওপর। শেষে আমার কাণ্ড দেখে অনেক হাঙ্গামা হুজ্জৎ করে এখানে পাঠিয়ে দিলে পরমানন্দ, আমার বড় ছেলে।

আমার ইহলোকের একচল্লিশজন পাওনাদার হাল ছেড়ে দিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, তারা আর এখান পর্যন্ত ধাওয়া করবে না। কিন্তু আমার পরলোকের পূর্বপুরুষদের হামলা বেড়েই চলেছে দাদা। তাঁরা যেখানে যখন খুশি অনায়াসে যেতে পারেন, একটি আধলা খরচ নেই। কি শনিবারে এক পুরুষ আগেকার পূর্বপুরুষ এসে তাঁর ঋণের বোঝা চাপিয়ে যাচ্ছেন আমার ওপর। গেল শনিবারে যিনি এসেছিলেন, তাঁর নাম মকরধ্বজ ভোজালী। আমি হচ্ছি তাঁর নাতি। পঁয়তাল্লিশ পুরুষের চক্রবৃদ্ধি ঋণের বোঝা চেপেছে আমার ঘাড়ে—সে যে হিসেব করলে কত লাখ টাকায় দাঁড়াবে তা বলা শক্ত।

আমার হাতে লেখা রয়েছে আমি আরো দশ বছর বাঁচব—আরো পাঁচ শো কুড়ি হপ্তা। এই পাঁচ শো কুড়ি হপ্তায় আরো পাঁচ শো কুড়ি পুরুষের চক্রবৃদ্ধি ঋণের বোঝা আমার ঘাড়ে চাপবে। কি সাংঘাতিক ব্যাপার ভেবে দেখুন একবার। অবিশ্যি শেষ পর্যন্ত সবই আমি চাপিয়ে যাব পরমানন্দের ঘাড়ে, পরমানন্দ

যথাক্রমে চাপাবে [illegible] ঘাড়ে, এমনি করে প্রত্যেক পুরুষ বোঝা চাপাবে তার পর পুরুষের ঘাড়ে। কিন্তু যদ্দিন ওপারে না পালাই, তদ্দিনের এই দশ বছর যে কি দুর্ভোগ আমায় সইতে হবে তা আর কহতব্য নয় দাদা। ফি শনিবারের রাতে পূর্ব-পুরুষদের দল বেঁধে আগিদের জ্বালাতন সইতে হবে আমাকে। হপ্তার পর হপ্তা দিয়ে যেতে হবে ভুয়ো কৈফিয়তের পর ভুয়ো কৈফিয়ৎ, কেন তাঁদের ধারের একটি আধলাও শোধ হচ্ছে না। এ অত্যাচারে আর কতদিন মাথা ঠিক রাখতে পারব জানিনে। আসছে বছর যদি এ সময় আবার বেড়াতে আসেন, হয় তো দেখবেন আমি সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেছি। যাবার আগে আমার শেষ বাণীটুকু শুনে যান : সাবধান, ভুলেও কোনোদিন ভোজ্জালী বংশে জন্মাবেন না।

প্রেম, পাগ্‌লামি আর কবিতা—এই তিনটির মধ্যে একটি যোগসূত্র আছে, এবং সেই যোগসূত্রটি হচ্ছে কল্পনা, এই তত্ত্বটি ডাক্তার ত্রিপাঠী ধার করেছিলেন শেক্‌স্‌পীয়ারের কাছ থেকে। সেই থেকেই তিনি এই বিশ্বাসটি মনে মনে খাড়া করে নিয়েছিলেন যে প্রত্যেক কবিই কিছু পরিমাণে পাগল, এবং প্রত্যেক পাগলই কিছু পরিমাণে কবি। অর্থাৎ যে কোনো কবিকেই ঠিকমতো আস্‌কারা দিয়ে যেতে পারলে তাকে শেষ পর্যন্ত পাগ্‌লা-গারদে ভর্তি করবার লায়েক করে নেওয়া যায়, এবং প্রত্যেক পাগলের ভেতরকার সুপ্ত কবিটিকে কায়দা করে একবার তাতিয়ে তুলতে পারলেই......ইত্যাদি।

ভবভূতি ভঞ্জ-র ভেতরকার সুপ্ত কবিটিকে ডাক্তার ত্রিপাঠী কি কৌশলে জাগিয়ে তুলেছেন জানবার চেষ্টা করি নি। শুধু জেনেছি তিনি শকুন্তলা স্যানাটোরিআমের সভাকবি—পোয়েট লরিএট্‌। কবিতার ভাবকল্প, ভাষা, আঙ্গিক ইত্যাদি নিয়ে বেপরোয়া নানারকম পরীক্ষা-

নিরীক্ষা চালাচ্ছেন, যাকে বলে এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট। কিন্তু কবিতা লিখবার জন্যে তাঁর কোনো বাঁধানো খাতা নেই। তিনি এলোমেলো টুকরো কাগজে কবিতা লিখে লিখে ঝুড়িতে ঝুলিয়ে রাখেন, বলেন "বাঁধানো খাতার বন্ধনের ভেতর আমার কবিতা ফুটবে না।"

"ভবভূতি ভঞ্জ-র কবিতার এই হচ্ছে আশ্চর্য মজা" বললেন ডাক্তার ত্রিপাঠী, "ওর যে কবিতার কোনো মানে নেই মনে হয় সে কবিতাতেই লুকিয়ে থাকে সব চেয়ে বেশী মানে; আর যে কবিতা মনে হয় মানে-তে ভরপুর, সে কবিতার আসলে কোনো মানে নেই। এই হচ্ছে আমাদের কবি ভবভূতির ডায়ালেক্‌টিক্‌। যেমন ধরো…"

বলে ভবভূতির একটি কবিতা থেকে আবৃত্তি করলেন তিনি :

"আমি ভবভূতি ভঞ্জ ।
বাস ছিল মোর ময়ূরভঞ্জে,
সেইখানে পড়ে রয়েছে মন যে,
ঘুম-চোখে দেখি : আরে, আরে একি,
এ কোন্‌ নূতন গঞ্জ ?
ডন-কুইক্সোট্‌ কোথা গেল মোর ?
আমি যে স্যাংকো পাঞ্জা !
মিছে কলিকায় কেন ভরি হায় গাঞ্জা ?
আঙিনায় মোর সোনার খাঁচায়
বিমনা যে পাখী পুচ্ছ নাচায়
একটি চাপড়ে দিয়েছিনু করে
তারি এক ঠ্যাং খঞ্জ—
আমি ভবভূতি ভঞ্জ।"

"কি মনে হয় এ কবিতা শুনে?" প্রশ্ন করলেন ডাক্তার ত্রিপাঠী। বললাম "মনে হয় গভীর অর্থযুক্ত কবিতা।"

"ভুল করছ ধনপতি।" হেসে বললেন ডাক্তার ত্রিপাঠী। "একটু ভেবে দেখলেই বুঝবে এ কবিতার কোনো মানে নেই।"

একটু ভেবে দেখে বললাম "হ্যাঁ, একদম মানে নেই বলেই মনে হচ্ছে যেন।"

বিজয়গর্বে বাঁ হাতের তালুর ওপর ডান হাতের চাপড় মেরে ডাক্তার ত্রিপাঠী বললেন "অথচ মানে-তে ভরপুর। রূপক আর প্রতীক একসঙ্গে এমন পাকা হাতে গুলেছে ভবভূতি, যে একে মিরাকল ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। কবিতাটি একটি দুর্দান্ত স্যাটায়ার, বিংশ শতাব্দীর গালে মেরেছে একটি প্রচণ্ড চাপড়, অথচ এমন আশ্চর্য সূক্ষ্মভাবে যে বিংশ শতাব্দীর বাবারও সাধ্য নেই টের পাবার। এ যে ফুল ফোটালে, না হুল ফোটালে, এ বুঝতে বুঝতে বিংশ শতাব্দী কেটে যাবে।"

"আশ্চর্য!!" বললাম আমি।

"মিরাকল!" বললেন ডাক্তার ত্রিপাঠী। "আমি তো বলি ভবভূতি ভুল করে এদেশে জন্ম নিয়ে ফেলেছে, নেবার আগে খেয়াল করেনি। ওর জন্মানো উচিত ছিল এজরা পাউণ্ড আর টি এস্ এলিঅটের দেশে। ওর আরেকটা কবিতা শোনো।"

বলে শোনালেন :

"তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখিনু
কাল চব্বিশে ফাগুন
হাউই বাজীর আগুনী ছোঁয়ায়
আকাশে লেগেছে আগুন
চাঁদে সে আগুন লেগে দেখি ভাই
কলংক তার পুড়ে হলো ছাই
তারারা চেঁচায় 'পুড়ে মারা যাই
আগুন জল্‌দি আগুন।'

সহসা মেঘের দমকল এলো

হাঁক ছেড়ে গুরু গুরু ;

ঝর ঝর ঝর বরষণ হলো শুরু ।

সে সুরে আগুন নিভিল তারার

চাঁদ ফিরে পেল কলংক তার

সেই সুর ধরে জেগে দেখি ভোরে

আজকে পঁচিশে ফাগুন ।”

শুধালেন "কি মনে হয় ?"

বললাম “মনে হয় কোনো মানে হয় না এ কবিতার ।”

আবার হাসলেন ডাক্তার ত্রিলোচন ত্রিপাঠী । বললেন “ভুল করলে ধনপতি । মনে হয় এ কবিতা গভীর ইঙ্গিতে, রূপকে, প্রতীকে, ব্যঞ্জনায়, তত্ত্বে ভরা । একে ফাগুন, বসন্তের সখা, তায় চব্বিশ তারিখ । তার ওপর আকাশে আগুন লাগা, চাঁদের কলঙ্ক পুড়ে যাওয়া, মেঘের দমকল, এসব তো রীতিমত গভীর ব্যাপার বলে মনে হয় । মনে হয় এ এক মহা ভাবপূর্ণ মিস্টিক কবিতা ।”

ভেবে বললাম "তা বটে ।"

ডাক্তার ত্রিপাঠী বললেন “কিন্তু না । প্রতীক ফ্রতীক এতে কিছু নেই, কোনো মানে নেই এ কবিতার । ফাগুন দেখে ভাবছ বসন্তের ইঙ্গিত দিতে চেয়েছে কবি, কিন্তু তা নয় । মাসটা বোশেখ কি চোত-ও হতে পারত, ফাগুন বসিয়েছে শুধু আগুনের সঙ্গে মেলাবার জন্যে । আর ঐ যে চাঁদের কলঙ্ক পুড়ে ছাই হয়ে গিয়ে চাঁদের আবার কলঙ্ক ফিরে পাওয়া, ও-তো আর কবিতা নয়—ও হলো পি. সি. সরকারের ম্যাজিক ।”

আমি বললাম “আশ্চর্য ! এভাবে আমি তো ভাবতেই পারিনি ।”

“অনেকেই পারে না । এই যে, শেঠজীর কুঠিরে পৌঁছে গেলাম । এসো ধনপতি ।” বললেন ডাক্তার ত্রিপাঠী । ঢুকে গেলাম শেঠজীর ঘরে । দেখলাম ফরাসের ওপর বসে আছেন শেঠ কিষেণলাল । তাঁর

মুখোমুখি বসে আছেন কবি ভবভূতি আর বাংলার গৌরব প্রফেসর ট্যালপেট্রো।

"আইয়ে ডাক্তারজী, আসুন ধন্‌পতিবাবু। দু'চার কবিতা শুনাচ্ছি গুরুজীকে।" বললেন শেঠজী, কবি ভবভূতির দিকে ডান হাত তুলিয়ে দিয়ে। বুঝলাম কবি ভবভূতিকে কবিতা লেখার গুরু বানিয়েছেন শেঠ কিষেণলাল ভরদ্বাজ।

"আরে রাম রাম, কি যে বলেন শেঠজী!" বললেন কবি ভবভূতি। "আমি হবো আপনার গুরু? কবিতা কি আর গান, যে তালিম দিয়ে শেখানো যাবে?"

ডাক্তার ত্রিপাঠীর কাছ থেকে শেখা কথা আউড়ে শেঠজীকে বললাম "আপনার ভেতরেই যে কবি ছিল সে জেগে উঠেছে মাত্র।"

"হাঁ, সে তো জরুর। কিন্তু জাগাইয়েছেন ভবভূতিবাবু।" বললেন শেঠ কিষেণলাল।

"আপনি কবিতা পড়ুন, শেঠজী।" বললেন কবি ভবভূতি।

"আমার পর্‌থম কবিতা আছে সমুন্দরের উপর—পুরীর সমুন্দর।" বলে পুরীর সমুদ্রের ওপর লেখা স্বরচিত কবিতা শুরু করলেন শেঠজী ঃ

"তুম্‌হার তটপর বৈঠে, হে সমুন্দর!
হে ভয়ংকর ঔর হে সুন্দর!
গিন্‌তি করি তুম্‌হার ঢেউ 'পর ঢেউ,
আগে বাঘ ঔর পিছে ফেউ।
তুম্‌হার জলমে, হে জলরাজ,
ডুবে নাও ঔর ডুবে জাহাজ,
আদ্‌মি ডুবে, ডুবে মাল,
লঙর ডুবে, ডুবে হাল,
তব্‌ ভি ডর না করে প্রাণ—
বীমা কম্পানী ভরে লোক্‌সান।"

জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে সব মাল সমুদ্রে ডুবে গেলেও ভয়ের কারণ নেই, কারণ লোকসান যা হবে বীমা কোম্পানীই তা পূরণ করে দেবে।

শেঠজী পড়ে চললেন ঃ

"হে মহাসাগর, হে গম্ভীর!
বহুৎ হাঙ্গর ঔর বহুৎ কুম্ভীর,
বহুৎ তিমি ঔর তমিংগেল
তুম্‌হার জলমে করে খেল্,
খেলে মাছ হাজারো হাজার
য্যায়সা শেয়ার ঔর ফট্‌কা বাজার।"

আশ্চর্য কল্পনাশক্তি শেঠজীর। সমুদ্র থেকে একেবারে শেয়ার মার্কেট! আমাদের অন্তর থেকে উৎসারিত হল সমবেত বাহবা-ধ্বনি। শেঠজী পড়লেন ঃ

"তুম্‌হার জল 'পর চলে লড়াই,
সাথে সাথ বাজার চড়াই,
শও-এর মাল বিকে হাজার,
কহে মূরখ কালা বাজার।
কমে মাল ঔর বঢ়ে ভাও,
মিলে মওকা, মারি দাঁও।
জয় সাগর, জয় নিমক-জল,
করে বন্দন নন্দনমল।"

যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি আর কালোবাজারের উৎপত্তির তত্ত্ব কবিতায় অপরূপ করে ফুটিয়ে তুলেছেন শেঠজী। কিন্তু 'নন্দনমল' কেন? নন্দনমল ছিল শেঠ কিষেণলালের ছেলেবেলার নাম। কবিতার জগতে এই নামটিই গ্রহণ করেছেন তিনি।

"আপ্‌কা ইয়ে কবিতা অপূর্ব, অনবদ্য হ্যায়।" বললেন প্রফেসর ট্যালপেট্রো।

কবি ভবভূতি বললেন "এর চেয়ে আরো অপূর্ব, আরো অনবদ্য 'শেয়ার বাজারে পাপিয়া' কবিতাখানা পড়ে শোনান তো শেঠজী।"

শেঠজী পড়ে শোনালেন :

"বেলা দুপহর, রোদ ঝম্ ঝম্, ভিড়-জমাট শেয়ার-বাজার।
বাজার ভাও উঠে, বাজার ভাও নামে, যেমন দরিয়ার ঢেউ।
লাখো লাখ, কড়োর কড়োর রুপেয়া করে হাথ-বদল,
হল্লা ভরপুর শেয়ার-বাজার।
হঠাৎ কৌন্ পপৈয়া কৌন্ ছাতে কৌন্ কুঠ্রিতে
প্রশ্ন পুছে : পিউ কাঁহা? পিউ কাঁহা? পিউ কাঁহা?
শেয়ার-বাজারী হল্লায় পপৈয়ার ডাক ডুব খায় :
কুহু কুহু! কাঁহা কাঁহা? কাঁহা পিউ? পিউ কাঁহা?
জবাব নাহি। কে দিবে জবাব? ফির কহে : পিউ কাঁহা?

জুট, হেশিয়ান, গানি, লোহা, ইস্টীল, আল্মুনিআম,
ফট্কা চলে বাহার হাজারো হাজার, লাখো লাখ,
আর ভিতর চলে হল্লা লাখো লাখ, কড়োর কড়োর।

লোনা ঢেউ শেয়ার-সমুন্দর, ডুবে ভাসে হাজারো নাও,
মধু ঢেউ ঢালে পপৈয়া, অরে মূরখ, জল্দি শোন
ভোল্ শেয়ার-ভাও, ফট্কা বাজার, ঐ সুরে সুর মিলা :
পিউ কাঁহা? পিউ কাঁহা? কাঁহা পিউ? পিউ কাঁহা?"

শুনে আমি মুগ্ধ। আবেশে চোখ মিটি মিটি করে প্রফেসর ট্যাল্পেট্রো বলতে লাগলেন "পিউ কাঁহা? পিউ কাঁহা? হায় হায় হায়, কানমে অমৃত ঝরা দিয়া শেঠজি! শেয়ার-মার্কেটকা তামাম গোলমালকো ছাপাকে পাপিয়াকা দিল্-দুলানা যাদুভরা সুর ধ্বনিত হো

উঠা : পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা? অনবদ্য কবিতা হুয়া, শেঠজি।"

শেঠজী বললেন "কবিতা আস্‌মান, ঔর রুপেয়া জমিন। রাবীন্দরনাথ বলিয়েছেন—কি বলিয়েছেন সে তো আপনারা জরুর জানেন, আমি আর নূতন কি শুনাবো?"

আমি বললাম "আশ্চর্য আপনার কবিতা, শেঠজি! অনেক দিন মনে থাকবে।"

শেঠজী বললেন "আপনার মেহেরবাণী, আর গুরুজীকী কৃপা।"

ধন্য কবি ভবভূতি ভঞ্জ, যদি তিনি শেঠ কিষেণলালের ভেতরকার সুপ্ত কবিকে এমন করে জাগিয়ে থাকেন।

"আমার জীবনের একটি মর্মস্পর্শী কাহিনী তোমায় শুনিয়েছি ধনপতি, যার নায়িকা তিলোত্তমা।" বললেন ডাক্তার ত্রিলোচন ত্রিপাঠী। "কিন্তু একটি কাহিনী তোমায় শোনানো হয়নি, যা আরো মর্মান্তিক। সে কাহিনী চিরদিন গোপন রাখব ভেবেছিলাম, কিন্তু তোমার কাছ থেকে কিছু গোপন রাখতে চাইনে। শোনো।"

কাহিনী শোনালেন ডাক্তার ত্রিপাঠী। যেমনটি শুনলাম ঠিক তেমনটি, হুবহু তারই জবানীতে লিখে রাখছি আমার ডায়েরিতে।......

কলকাতার উত্তর সীমান্ত থেকে মাইল বারো দূরে এক নিরালা বাগানবাড়িতে সূর্যকান্ত বরাটের শোবার ঘরে একটি স্বচ্ছ, পুরু কাঁচের চৌবাচ্চা। নামটা জমিদারোচিত হলেও, সূর্যকান্ত বরাট জমিদার নন, শুধু বিরাট বড়লোক।

আমাকে তিনি মাছ দেখাচ্ছিলেন চৌবাচ্চার জলে। মস্ত চৌবাচ্চায় আঙুলের মতো ছোট, রামধনুর মতো রঙিন একটিমাত্র মাছ।

তার মৃদু, অতিমৃদু গতিবিধি মুগ্ধচোখে দেখতে দেখতে সূর্যকান্ত বললেন "এমন আশ্চর্য মাছ আর কখনো দেখেছো ডাক্তার ?"

সে-প্রশ্নের একটিমাত্র সহৃদয় জবাব হতে পারে। বললাম "আজ্ঞে না।"

সূর্যকান্ত বললেন "দেখা সম্ভবও নয়। হনলুলু থেকে সোজা চৌবাচ্চাতেই দুটি এসেছিল, একটি এই চৌবাচ্চাতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে চলে গেছে। রঙিন মাছ মারা গেলে তার আত্মা কোথায় যায় বলতে পারো ডাক্তার ?"

ডাক্তারী শাস্ত্রে এ-তত্ত্ব লেখা নেই। বললাম "আজ্ঞে না।"

সূর্যকান্ত বললেন "আমিও পারিনে। কিন্তু আমার মনে হয় এই মাছটি এখনো তাকে ভুলতে পারেনি। দেখেছো তো দুটি চোখে কী বিষণ্ণ দৃষ্টি ? ওর বিরহ-ব্যথার হাহাকার আমি যেন কানে শুনতে পাই, ডাক্তার।"

বললাম "আহা বিরহী বেচারা !"

"বিরহী কি বিরহিণী সেইটেই রহস্য, ডাক্তার।" বললেন সূর্যকান্ত। "মাছের মনস্তত্ত্ব যদি-বা খানিক বুঝি, দেহতত্ত্ব একেবারে নয়।"

"তাহলে একজন মাছ-বিশেষজ্ঞ আনিয়ে বরং—"

"না, ডাক্তার। এসেছিল মৎস্য-দম্পতি, একজন চলে গেল। নাই-বা জানলাম বাকী রইল রহস্যময়, না রহস্যময়ী।"

রঙিন মাছটির মুখ থেকে জলের কয়েকটি বুদ্‌বুদ ওপর দিকে উঠে গেল। মৃদু একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো সূর্যকান্ত বরাটের বিরাট বুকের ভেতর থেকে। "পড়তি বয়সে সাথীহারার দিনরাত জুড়ে কী যে মরু-সাহারার হাহাকার, তা তুমি বুঝবে না, ডাক্তার।" বললেন তিনি। "কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে ?" বলে তাকালেন ওপাশের দেয়ালের গায়ে ঝোলান তাঁর স্বর্গীয়া

পত্নীর অয়েল-পেন্টিং-এর দিকে। তলায় লেখা রয়েছে জন্ম-তারিখ আর মৃত্যু-তারিখ।

বললাম "বারো বছর হলো আপনার স্ত্রী-বিয়োগ ঘটেছে?"

"সওয়া বারো বছর।" বললেন সূর্যকান্ত। "তার বহু আগে থেকেই ছেলেটাকে মানুষ করছে বিনোদিনী। বিনোদিনীকে না পেলে কী হতো জানিনে, ডাক্তার।"

"বিনোদিনী কে?" মুখ থেকে হঠাৎ ফস্‌কে গেল কৌতূহলী প্রশ্ন। চিন্তিত হলাম। অতি কৌতূহল যেন প্রকাশ করে না ফেলি কখনো সাবধান করে দিয়েছিলেন ভুবনকাকা।

সূর্যকান্ত বললেন "ঐ যে বললাম, নবকান্তকে যে মানুষ করেছে। এই নবকান্তই তোমার এক নম্বর পেশেণ্ট। আমি হলাম দু'নম্বর। আর বৌমাকেও হয়তো মাঝে মাঝে একটু···সে তুমি ধীরে ধীরে সবই জানতে পারবে ডাক্তার, ফ্যামিলি-ফিজিশিয়ান হলে যখন।"

বললাম "আপনার ছেলেকে এখনো দেখিনি। বৌমাকেও নয়।"

সূর্যকান্ত বললেন "নবকান্ত এখন স্টুডিওতে ছবি আঁকছে। বৌমাও আছে সেখানেই।"

"আপনার ছেলে আর্টিস্ট?"

"আর্টিস্ট। অসাধারণ আর্টিস্ট। ও একটা বিরাট জিনিয়াস।" বললেন সূর্যকান্ত। "মাঝে মাঝে ঐ জিনিয়াসের প্রচণ্ড ধাক্কা ওর দুর্বল ক্ষীণ দেহে ও সইতে পারে না। কখনো ক্ষেপে ওঠে, কখনো অসার হয়ে যায়, কখনো-বা—সে তুমি নিজেই দেখে নিয়ো, ডাক্তার। ওসব লক্ষণের অনেক ল্যাটিন নাম-টাম হয়তো তোমাদের ডাক্তারি-শাস্ত্রে আছে। আমার মনের উদ্দাম ক্ষ্যাপামি রক্তের ধারায় পেয়েছে নবকান্ত, কিন্তু ঐ-যে বলেছি, দেহটা ওর বড় দুর্বল, আমার মতো পোক্ত নয়। তুমি দেহের ডাক্তারিতে হাত পাকিয়েছ বটে, তবু মনের ডাক্তারিও জানো জেনেছি। তাই তোমাকেই ডেকে এনেছি

বরাট-বাড়ির ফ্যামিলি-ফিজিশিয়ান হতে।"

"কার কাছে শুনলেন আমি মনের ডাক্তারিও জানি?"

"তোমার ভুবনকাকার কাছে। ভুবনবাবু তোমার বাবার কিরকম ভাই হে, ডাক্তার?"

"আজ্ঞে, ভাই নন, বাল্যবন্ধু।"

"তাহলে তো আরো ভালো, ডাক্তার। রক্তের সম্পর্কের চাইতে পাতানো সম্পর্ক ঢের বেশী রোমান্টিক। জানো কি না জানিনে, আমি আমার বাবার পাতানো ছেলে। আমাকে যিনি জন্ম দিয়েছিলেন, তিনি জন্ম ছাড়া আর কিছু দেননি। পাতানো বাবা আমাকে দিলেন তাঁর পদবি, আর যাবার আগে দিয়ে গেলেন তাঁর প্রচুর টাকা। চলে যাবার আগে স্বামী বানিয়ে রেখে গেলেন আমাকে; ঐ যাঁর ছবি দেখতে পাচ্ছ তাঁর। এইবারে একটু আত্মনিন্দা করব, ডাক্তার।"

"করুন।"

"তোমরা যাকে বাংলায় লম্পট বলো, আর ইংরেজিতে স্কাউনড্রেল, বছরের পর বছর আমি ছিলাম ঠিক তাই। কিন্তু দোষ আমার নয়, ডাক্তার—দোষ আমার রক্তের। আর দোষ আমার ভাগ্যবিধাতার; তিনি বড় কমবয়সে আদর করে আমার হাতে বড় বেশী টাকা দিয়েছিলেন। পাতানো বাবার টাকা পাবার পর আরো অনেক টাকা পেলাম বিধবা এক পাতানো মাসীর; মস্ত বড়লোক স্বামীর নিঃসন্তানা উত্তরাধিকারিণী দেখে যাঁকে মাসী বলে ডেকেছিলাম। স্ত্রী রইলেন ঘরের এক কোণে ভুলে যাওয়া আসবাবের মতো, আর আমি মেতে রইলাম বাইরে বাইরে জীবন কাটাবার অ্যাডভেঞ্চারে। আমার সেই কয়েক বছরের লাম্পট্যের ক্যাটালগ শুনে তুমি আর এখন কি করবে ডাক্তার? নাই বা ঘাঁটলাম ওসব পুরোনো কাসুন্দি। শুধু বলি, শেষটায় অবসাদ এলো দেহে মনে। একদিন মাঝরাতে চিত হয়ে শুয়ে

শুনছিলাম দূর থেকে ভেসে আসা গান। সে গান হঠাৎ একবার থেমে গেল। সব গানই তো কখনো না কখনো থেমে যায়। কিন্তু তখন কি আমার মনে হলো জানো ডাক্তার ?"

"জানিনে।"

"মনে হলো একদিন হঠাৎ আমিও থেমে যাবো, মিলিয়ে যাবো চিররাত্রির অসীম শূন্যতায়। হঠাৎ বুকের ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগতে লাগল, মনে হলো যেন দম বন্ধ হয়ে আসবে। সে দুঃসহ অস্বস্তি তুমি বুঝতে পারবে না ডাক্তার, যদি না বুকের ভেতরে কোনোদিন তেমনি শূন্যতা অনুভব করে থাকো।"

"তারপর ?"

"বাইরে থেকে নিজেকে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম ঘরের দিকে। চাইলাম সন্তান, চাইলাম বংশধর—যার ভেতর আমি বেঁচে থাকব, মৃত্যুর পর ফুরিয়ে যাবো না। তারপর ? যে-বয়সে কেউ কেউ পিতামহ হয়, সে-বয়সে আমি প্রথম পিতা হলাম। সেই আমার প্রথম, আর সেই আমার শেষ পিতৃত্ব।"

মনে হলো বড় রকমের দায়িত্ব চাপছে আমার ডাক্তারি ঘাড়ে। যে-নবকান্তর মধ্যে বেঁচে থাকতে চান সূর্যকান্ত, সেই অসাধারণ প্রতিভাধর নবকান্তকেই বাঁচিয়ে রাখতে হবে আমাকে।

"হ্যাঁ, কি বলছিলাম ?" বলতে লাগলেন সূর্যকান্ত। "সেই আমার শেষ পিতৃত্ব। নবকান্তকে পৃথিবীর আলোয় আনবার জন্যে তার মা'র শীর্ণ দুর্বল দেহের ওপর দিয়ে যে মহাপ্রলয়ের ঝড় বয়ে গেল, তাতে সে-যাত্রা তিনি প্রাণে বেঁচে গেলেন বটে, কিন্তু বাকী জীবনের মতো তাঁকে ইন্‌ভ্যালিড হতে হলো। রইল না আর মাতৃত্বের সম্ভাবনা। আর প্রয়োজনও ছিল না ডাক্তার, কারণ বেঁচে গেল আমার বংশধর নবকান্ত। আর ঠিক সেই সময়—মেজাজ ভালো থাকলে বিধাতা কী চমৎকার যোগাযোগ ঘটাতে পারেন ভেবে ভাখো, ডাক্তার—

বিধবা হলো বিনোদিনী। বিনোদিনীর উড়নচণ্ডী স্বামী শুধু জীবন নিয়েই খুশী ছিল, জীবনবীমার প্রয়োজন বোধ করেনি, রেখে যায়নি কোনো সঞ্চয়। চলে যেতে চায়নি ভবকিশোর। জীবনকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছিল। বিনোদিনীর মতো সঙ্গিনীর সঙ্গ ছেড়ে চলে যেতে চাওয়া সহজে কোনো পুরুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। কিন্তু যম যখন নিয়ে যাবে বলে কোমর বাঁধে, তখন কোনো ডাক্তারের বাবাও তাকে আটকাতে পারে না।"

আমি হেসে বললাম "তাহলে আর ডাক্তার ডাকা কেন?"

"যম তো সব সময় কোমর বাঁধে না, ডাক্তার।" বললেন সূর্যকান্ত বরাট। "মাঝে মাঝে সে শুধু একটু ভয় দেখাতে দূত পাঠায়।"

এমন সময় দরজার ঠিক বাইরে থেকে মেয়েলী কণ্ঠের প্রশ্ন শোনা গেল, "আসব?"

"এসো, বিনু।" বললেন সূর্যকান্ত বরাট। এলেন বিনোদিনী। সরু কালোপাড়ের ধুতি তাঁর দেহ ঘিরে শাড়ির রূপ নিয়েছে। পায়ে নাগরাই। পিঠ-ছাওয়া প্রচুর এলো চুলে ঈষৎ ধূসরতার আভাস। বয়স বোধকরি প্রৌঢ়ত্বের কাছাকাছি, যৌবন তবু যেন মায়া কাটিয়ে চলে যেতে চাইছে না ঐ দেহ থেকে।

হাতে ছোট্ট সুন্দর একটি টিনের কৌটা। সহসা আবির্ভাবের কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গীতে বিনোদিনী বললেন "সাবিত্রীকে খাওয়াবার সময় হয়েছে।"

সূর্যকান্ত বললেন "এ মাছটিকে বিনু 'সাবিত্রী' বলেই ভেবে নিয়েছে, ডাক্তার। ওরা যখন দুটিতে জোড় বেঁধে এসেছিল হনলুলু থেকে এই চৌবাচ্চায়---বিনু আর আমি ওদের নাম দিয়েছিলাম সাবিত্রী-সত্যবান। দুটিই দেখতে একরকম—গুলিয়ে যেত কোন্‌টা সাবিত্রী, কোন্‌টা সত্যবান।"

বিনোদিনী বললেন "চলে গেছে সত্যবান, রয়ে গেছে সাবিত্রী।

মেয়ে-প্রাণ সহজে যায় না, বরাট মশাই।"

হয়তো খেয়াল হলো অপরিচিত নবাগতের সামনে কথাটার সুর—হয়তো ভাষাও—অন্যরকম হলে ভালো হত। তাই আবহাওয়া বদলে দেবার জন্যে আমার দিকে তাকিয়ে বিনোদিনী বললেন "আপনাকে পেয়ে বড় নিশ্চিন্ত হলাম, ডাক্তার। ভগবানই আপনাকে পাঠিয়েছেন।"

"ভগবান নয়। ভুবনবাবু।" বললেন সূর্যকান্ত।

হাসলেন বিনোদিনী। নিখুঁত মুক্তোর সারির মতো ঝকঝকে সাদা তাঁর দুপাটি দাঁত। বললেন "ভগবান কাকে দিয়ে, কখন কাকে কেন পাঠান বোঝা শক্ত, বরাট মশাই।" মনে হলো আবার একটা রহস্যময় হাসির মৃদু আভাস সহসা খেলে গেল তাঁর মুখে।

এ প্রশ্নের কোনো জবাব দিলেন না সূর্যকান্ত। জবাব দেবার প্রশ্নও এ নয়।

"দাসীকে দিয়ে আপনার চা জলখাবার পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, নিজে আসতে পারিনি। ত্রুটি মার্জনা করবেন, ডাক্তারবাবু।" বললেন আমাকে বিনোদিনী। "নবুকে নিয়ে বড় ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল অনেকক্ষণ।"

সূর্যকান্ত বললেন "আবার বুঝি সেইরকম—?"

"হ্যাঁ, আজকেও। ঠাণ্ডা করতে বড় বেগ পেতে হয়েছে।"

লক্ষ্য করলাম উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে সূর্যকান্তর মন। তিনি বললেন "এভাবে যদি ওর বাড়াবাড়ি বেড়ে চলতে থাকে, শেষকালে একদিন হয়তো বড় বেগ পেয়েও ওকে ঠাণ্ডা করতে পারবে না, বিনু। ···কিন্তু তুমি এসে পড়েছ, এখন আর ভাবনা নেই, ডাক্তার। আমাদের কাছে যা কঠিন রহস্য, তোমার কাছে হয়তো তা জলের মতো পরিষ্কার। শরীর আর মন—দুই তোমার এক্তিয়ারে। ···বিনু, এবারে খাওয়াও তোমার সাবিত্রীকে। ডাক্তার এখন আর বাইরের অতিথি নয়, আমাদের ঘরের লোক।"

রামধনু-রঙা মাছটিকে খাওয়াতে লাগলেন বিনোদিনী। সুদৃশ্য টিনের কৌটোর ভেতর থেকে ছোট ছোট খাবারের দানা ওপর থেকে একটি একটি করে ফেলে দিতে লাগলেন তিনি, আর মাছটি খেতে লাগল ধীরে ধীরে। আমার অস্তিত্ব কিছুক্ষণের জন্যে ভুলে গেলেন সূর্যকান্ত বরাট; মুগ্ধনেত্রে দেখতে লাগলেন বিনোদিনীর সেই অনায়াস জাদু। মনে হলো, রঙিন কল্পনায় ঐ চৌবাচ্চার রঙিন মাছের সঙ্গে এক হয়ে গেছেন তিনি, ভাবছেন বিনোদিনী সযত্নে আপন হাতে খাইয়ে দিচ্ছেন তাঁকে, আর তিনি খেয়ে চলেছেন একটু একটু করে রসিয়ে রসিয়ে পরম তৃপ্তিতে।

কেন জানিনে, হঠাৎ আমার একবার মনে হলো যেন বিনোদিনীর চোখ দিয়েই দেখছি চৌবাচ্চায় ঐ রঙিন মাছটিকে। সে যেন সাবিত্রী নয়, সত্যবান—আর সত্যবানের চেহারায় কোথায় যেন সূর্যকান্তর আভাস। চৌবাচ্চার মুখোমুখি বিনোদিনীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন সূর্যকান্ত।

মাছটিকে ব্রেক্‌ফাস্ট খাওয়ানো শেষ করে বিদায় নিয়ে অন্দরে চলে গেলেন বিনোদিনী।

কিন্তু এভাবে গল্প বলতে গিয়ে আমি হাঁফিয়ে উঠছি।

এবারে তাই কায়দা বদলানো যাক।

কলকাতার মাইল বারো দূরে এই বাগানবাড়ির স্বত্ব নিয়ে একটা মামলা বেধেছিল। মামলায় হেরে গিয়ে এমন পছন্দসই নিরালা বাগানবাড়িটি হারাবেন বলে ভয় করছিলেন নির্জনতাপ্রিয় সূর্যকান্ত। তাঁর পক্ষের উকিল হলেন ভুবন দত্ত। মামলা জিতেছিলেন সূর্যকান্ত। তাঁর ধারণা ভুবন দত্তের অসামান্য ওকালতি প্রতিভার দৌলতেই তিনি মামলা জিততে পেরেছেন, তা না হলে নিশ্চয়ই বিশ্রীরকম হেরে যেতেন। সেই থেকে ভুবন দত্ত তাঁর কাছে একজন কেষ্টো-বিষ্টু বিশেষ, ভুবন দত্তের বাক্য তাঁর কাছে বেদবাক্য। ভুবনকাকাকে তিনি

বানিয়ে নিয়েছেন তাঁর আইন উপদেষ্টা—লিগ্যাল অ্যাডভাইজার। প্রতিমাসে ঐ বাবদে ভালো মাসোহারা পান ভুবনকাকা—পান, মানে তাঁকে নিতেই হয় নাছোড়বান্দা সূর্যকান্তর কাছ থেকে। গ্রহীতার চাইতে দাতার ব্যগ্রতা বেশী।

যখন থেকে কাহিনী শুরু করেছি, তার সামান্য কিছুদিন আগে মাত্র ঐ নিরালা বাগানবাড়িতে এসে বসবাস শুরু করেছেন বরাট পরিবার। স্থান, পরিস্থিতি, আবহাওয়া সব কিছু পরম পছন্দ হয়েছে সূর্যকান্তর। শহর থেকে দূরে লোকসমাজ থেকে যদ্দুর সম্ভব বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে চান তিনি। লোকের ঈর্ষা, কৌতূহল, সহানুভূতি কিছুই কুড়োতে চান না।

"একজন ভালো অথচ বিশ্বস্ত ডাক্তার ঠিক করে দিতে পারেন ভুবনবাবু? ফ্যামিলি-ফিজিশিয়ান?" বলেছিলেন সূর্যকান্ত। "গোপন কথা যার কাছে খুলে বলা যাবে, ঘরের লোকের মতন দরদী হয়ে চিকিৎসা করবে যে ডাক্তার, সর্বদা শুধু পকেট মারবার ফন্দি আঁটবে না। দক্ষিণা তাঁকে আমি দেবো, প্রচুর দেবো, ভুবনবাবু; না চাইতেই দেবো। ভগবান আমাকে অনেক দিয়েছেন, আর কৃপণ বানাননি। শুধু চাই প্রাণের বন্ধুর মতো দরদী ডাক্তার, অথচ যার আছে অভিজ্ঞতা আর হাতযশ।"

"দেবো আপনাকে। ঠিক যেমনটি চান তার চাইতেও বেশী। ডাক্তার ত্রিলোচন ত্রিপাঠী। আমার ভাইপো। হ্যাঁ, ভাইপোর চেয়েও বেশী।" বলেছিলেন ভুবনকাকা।

"আপনার ভাইপো!!!!!" আনন্দে চিৎকার করে বলেছিলেন সূর্যকান্ত। "তাকে আমার চাই-ই, ভুবনবাবু। তাকেই আমার চাই।"

ভুবনকাকা বলেছিলেন "নিশ্চয় পাবেন। আমার কথা ফেলতে পারবে না ত্রিলোচন।"

এরই ফলে সূর্যকান্ত বরাট পেয়েছিলেন আমাকে। আসল কথা, আমারই বরাত খুলে গিয়েছিল বরাট-বাড়ি থেকে মোটা মাসোহারার ব্যবস্থা হয়ে। সূর্যকান্তর সেই বাগানবাড়িতেই দোতলায় চারিদিক খোলা সবচেয়ে ভালো ঘরে আমি থাকতে লাগলাম রাজার হালে। আমার সুখ-সুবিধার যতরকম সম্ভব ব্যবস্থা করে দিলেন সূর্যকান্ত।

কলকাতার বাজার থেকে যাতে বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ি সেজন্য আমার কলকাতার চেম্বারে রোগী দেখা চলতে লাগল রোজ বিকেলে দু ঘণ্টা করে। যাতায়াতটা, বলা বাহুল্য, বরাট বাগানের গাড়িতেই হতো। দু চারদিনের মধ্যেই বরাট পরিবারের রহস্য আমার কাছে দ্রুতবেগে পরিষ্কার হতে শুরু করল।

সূর্যকান্তর সঙ্গে একদিনের কথা বলি :

"তোমাকে খুলে বলতে তো বাধা নেই, ডাক্তার।" বললেন সূর্যকান্ত। "বাপের মত মজবুত দেহযন্ত্র আর প্রাণশক্তির প্রাচুর্য পায়নি নবকান্ত, কিন্তু বাপের রক্ত থেকে নিজের রক্তে সংক্রামিত লাম্পট্যের নেশায় তো তার জন্মগত অধিকার। আমি তার সে অধিকার অস্বীকার করিনি, ডাক্তার। তার দেহে মনে যখন এলো যৌবনের জোয়ার, সেই জোয়ারে বেড়াবার উদ্দাম স্বাধীনতা আর পূর্ণ সুযোগ আমি তাকে দিলাম। ভাবলাম, যৌবনে নিজেকে কোনোরকমেই বঞ্চিত করিনি, ছেলেকে বঞ্চিত করব কোন্ অধিকারে? শুধু হুঁশিয়ার হলাম, একটা দুরারোগ্য ব্যাধি বাধিয়ে না বসে। কিন্তু পেটরোগা ভোজনলোভীর পঞ্চান্নব্যঞ্জনী রাজভোগের ধাক্কা সইল না। কুচো-চিংড়ির প্রাণশক্তি নিয়ে ডন-জুয়ান হওয়া যায় না, ডাক্তার। ধাক্কার জের সামলাতে সমুদ্রের ধারে কিছুদিন হাওয়া বদল করে এলো নবকান্ত। বিবেকের কাছে পরিষ্কার রইলাম আমি—ছেলে কোনদিন বলতে পারবে না, বাপ তাকে বে-লাগাম লাম্পট্যের স্বাদ নেবার পুরো সুযোগ দিতে একফোঁটা কসুর করেছে।

কি বলো ডাক্তার ?"

আমি বললাম "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কিন্তু অত দরাজ দিল হওয়া আমার উচিত হয়নি, ডাক্তার।" বললেন সূর্যকান্ত।. সবার সব সয় না, এইটে বোঝা উচিত ছিল আমার। বুঝিনি বলে আফসোস করি, তাও নয়। কোনো কিছুর জন্যেই আফসোস করে না সূর্যকান্ত বরাট। হাওয়া বদলে ফিরে এলো নবকান্ত, ওষুধে টনিকে ডাক্তারে নার্সে অনেক টাকা উড়িয়ে। কিন্তু কি যেন হলো ওর। উড়ু উড়ু মন, ঝুরু ঝুরু চোখ, দুরু দুরু বুক। 'এইবারে একটি টুকটুকে বৌ এনে দিন খোকাকে'—বললে বিনোদিনী। মানুষ করেছে সে-ই নবকান্তকে, নবকান্ত তাই বিনোদিনীর কাছে খোকা, চিরদিনের খোকা। তারপর যে লোভ দেখালে বিনোদিনী, সূর্যকান্ত তা সামলাতে পারলে না, ডাক্তার।"

'কী সে লোভ ?'—মনের এ প্রশ্ন মুখে আনলাম না। জবাব তবু পেলাম।

"বছর ঘুরে টুকটুকে বৌমার কোল জুড়ে আসবে আমার একটি টুকটুকে নাতি, বরাট বংশের নতুন বংশধর—এই লোভ আমাকে দেখালে বিনোদিনী।" বললেন সূর্যকান্ত। "মনের তলায় অনেকদিন থেকে গোপনে জন্মেছিল ঠিক এই লোভেরই পদ্ম কুঁড়ি, বিনোদিনীর কথার জাদু-হাওয়া লেগে এবার ফুটে উঠলো সবগুলো পাপড়ি মেলে। সোজা কথায় আমি বৌমা পাবার জন্যে যেমন ক্ষেপে উঠলাম—বৌ পাবার জন্যেও তেমন ভয়ানক ক্ষ্যাপা ক্ষেপেনি নবকান্ত।"

"তারপর ?"

তারপর সূর্যকান্ত সকল খোঁজা ধন্য করে, খবরের কাগজে "বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত বাঙালী ধনীর তরুণ, সুপুরুষ, সচ্চরিত্র ও স্বাস্থ্যবান একমাত্র পুত্রের জন্য ১৯ বছরের অনধিক স্বাস্থ্যবতী এবং প্রকৃত সুন্দরী পাত্রী চাই। মধ্যবিত্ত বা গরীব পরিবারে আপত্তি নাই।"—বিজ্ঞাপনের

জবাবে আগে চিঠিপত্রে যোগাযোগ ঘটিয়ে, তারপর এসে সূর্যকান্তর বাড়িতে সসংকোচে দেখা দিলেন—ম্যাকিন্টস, ভটচাযি্য অ্যাণ্ড কোম্পানির কেরানী জগমোহন রুদ্র।

সূর্যকান্ত শুধালেন "মেয়েটি প্রকৃত সুন্দরী তো?"

জগমোহন রুদ্র বিনীত কণ্ঠে বললেন "আজ্ঞে, দেখলে আপনার হয়তো অপছন্দ হবে না।"

ড্রাইভারকে গাড়ী বার করতে বললেন সূর্যকান্ত। গাড়ীতে রুদ্রকে তুলে নিয়ে গেলেন রুদ্রের ডেরায়। চমকে উঠলেন জগমোহন রুদ্রের ভাগনী পদ্মাকে দেখে। আঁধার ঘেরা আঁস্তাকুড়ে অমূল্য হীরের টুকরো জ্বলজ্বল করছে যেন। "বয়স কত হলো?" শুধালেন সূর্যকান্ত। "আজ্ঞে, আঠারোয় পা দিয়েছে।" বললেন জগমোহন। "পছন্দ হলো কি আপনার?"

সূর্যকান্ত বললেন "এ যে রাজরানী হবার মেয়ে, রুদ্র মশাই।"

"আপনার ঘরে গেলে তো রাজরানীই হবে আজ্ঞে।" বললেন জগমোহন রুদ্র।

"আমার সবেধন নীলমণি আমার সোনার টুকরো ছেলে, আমার বুকের একটি পাঁজর।" বললেন সূর্যকান্ত। "সেই সোনার টুকরোর পাশে তোমার হীরের জ্যোতি দেখতে পেলে, তারপর আমি সুখে মরতে পারবো, মা! যাবে মা তুমি আমার ঘরে?"

নীরবে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল পদ্মা।

"বুড়োকে কি শ্বশুর বলে পছন্দ হয়নি, মা?" শুধালেন সূর্যকান্ত।

জগমোহন রুদ্র ভাগনীকে বললেন "মুখ বুজে দাঁড়িয়ে রইলি কেন, বোকা মেয়ে? বল্ পছন্দ হয়েছে।"

মামার কথা রেখে পদ্মা তেমনি মাথা নত রেখেই বললে, "হয়েছে।"

"শুধু হয়েছে বললেই হয়? পেন্নাম করতে হয় যে।" বললেন, মামা জগমোহন। এবারেও মামার অবাধ্য হলো না পদ্মা। নত

হয়ে প্রণাম করল সূর্যকান্তকে। সৌভাগ্যবতী হও, মা।" আশীর্বাদ করলেন সূর্যকান্ত।

"তা তো হতেই চলেছে আজ্ঞে।" বিনীত হাসি হেসে বললেন জগমোহন।

মেয়েটিকে বিস্ময়মুগ্ধ, পলকহীন দৃষ্টিতে দেখেছিলেন সূর্যকান্ত। এমন আশ্চর্য সুন্দরী মেয়ে তিনি জীবনে দেখেননি। চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করছিল না তাঁর।

কিন্তু তিনি অনুভব করলেন এবারে এমন কিছু কথাবার্তা কইতে চাইছেন জগমোহন, যা তিনি ভাগনীকে শোনাতে চান না; পদ্মাকে এবারে অন্দরে ফেরত পাঠানো দরকার। সুতরাং নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বললেন, "তোমায় আর কষ্ট দেবো না, মা। এবার তুমি ভেতরে যেতে পারো।"

নিঃশব্দে ভেতরে চলে গেল পদ্মা, অপরূপ সুন্দর ধীর পদক্ষেপে। যেটুকু সময় লাগল তার অদৃশ্য হয়ে যেতে, তারই দিকে তাকিয়ে রইলেন সূর্যকান্ত।

"এ মেয়েটিকে আমার চাই, রুদ্রমশাই।" বললেন তিনি "অবশ্য আমাদের সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে যদি আপনারা—"

"ছি ছি ছি ছি ছি! খোঁজখবরের কথা বলে লজ্জা দিচ্ছেন আমাকে। আপনি হলেন গিয়ে স্বনামধন্য পুরুষ।" বললেন জগমোহন রুদ্র। "তা ছাড়া খোঁজটোজ যা নেবার তা আমি আগেই নিয়ে নিয়েছি যে। আপনিই বরং যদি আমাদের সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে চান তাহলে—"

"কিছু দরকার হবে না, রুদ্রমশাই। শাস্ত্রে বলেছে—স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি। মেয়েটিকে পছন্দ হয়েছে, মেয়েটিকে নিয়ে যাবো ঘরের লক্ষ্মী করে। ব্যাস্।"

"কিন্তু তার আগে আমার দু'চারটে নিবেদন আছে।" বললেন

জগমোহন রুদ্র।

"বলুন।" বললেন সূর্যকান্ত।

"পদ্মা আমার বাপ মা মরা ভাগনী।" বললেন জগমোহন।

"তা তো জানি। চিঠিতেই লিখেছিলেন আপনি।"

"কিন্তু সব কথা চিঠিতে লিখিনি আজ্ঞে। লেখা যায়ও না।" বললেন জগমোহন। পদ্মার মা আমার দূর সম্পর্কের বোন, তবু বোন তো বটে। সে যখন সিঁথের সিঁদুর মুছে কচি মেয়েটাকে হাত ধরে এসে 'দাদা' বলে কেঁদে পড়ল,—সে আজ দশ বছরের কথা—তখন তাকে কিছুতেই ফেরাতে পারলুম না, আমার অভাবের সংসারেও আশ্রয় দিতেই হলো। সেই থেকে এদের দুজনের খাওয়া পরা—অসুখ বিসুখে ডাক্তার ওষুধ সবই চালাতে হয়েছে। খরচা হিসেব করলে মোট হাজার ছয়েক টাকা তো হবেই। তা ছাড়া জগদীশের ব্যামোতেও—জগদীশ, মানে আমার বোনাই—চিকিচ্ছের ভার আমাকেই নিতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত বাঁচলে না বটে, কিন্তু ওষুধে ডাক্তারে আমার পাক্কা দু'হাজার টাকা জলের মতো বেরিয়ে গিয়ে ছাপোষা মানুষ আমি দেনায় তলিয়ে গেলাম। সুদে আসলে যখন বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে উঠল তখন গিন্নীর গহনা বন্ধক দিয়ে নতুন ধার করে পুরোনো দেনা শুধতে হলো। তারপর…"

ইঙ্গিতটা বুঝে নিলেন সূর্যকান্ত। নগদ দশহাজার টাকায় রফা হলো। পুত্রবধূকে দূর সম্পর্কের মামার কাছে ঋণী রাখবেন না তিনি। বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেল। চোখের জল খানিকটা ফেললেন জগমোহন রুদ্র, পদ্মার মা'র কথা ভেবে। মাত্র তিন মাস হলো সে মারা গেছে। মাত্র এই ক'টা মাসের জন্যে বেচারা দেখে যেতে পারল না তার মেয়ে রাজরানী হতে চলেছে।

"আরেকটি বিনীত নিবেদন আছে আজ্ঞে।"

"কি?"

"আপনি শুধু আমার ভাগনীর জগদ্ধাত্রীর মতো রূপটাই দেখলেন। গুণের কথাটাও বলি। পাকা ছবি আঁকিয়ে ছিল পদ্মার বাপ— জগদীশ। পদ্মা বাপের গুণ পেয়েছে। জগদীশ মরবার সময় আমার হাত ধরে বলে গিয়েছিল পদ্মাকে যেন আমি শিল্পী হবার সবরকম সুবিধে করে দিই। আমার সাধ্যমতো দিয়েও ছিলাম। আপনার ঘরের লক্ষ্মী করে যখন নিয়ে যাবেন পদ্মাকে, তখন—"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়।" বললেন সূর্যকান্ত। "স্টুডিও করে দেবো বাড়িতে—ওরা দুটিতে একসঙ্গে শিল্পের সাধনা করবে।"

আশ্চর্য! আশ্চর্য! আশ্চর্য যোগাযোগ-প্রতিভা বিধাতার! নবকান্তর শিল্প প্রতিভা যেমন অসাধারণ, তেমনি তারি সুযোগ্যা জীবনসঙ্গিনী। কী অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত ভাবে মিলিয়ে দিলেন তিনি!

একেই বলে রাজযোটক, ভাবলেন সূর্যকান্ত। কী সর্বনাশ হত এমন মেয়ে যদি কোনো গরীব ঘরে, কোন অপদার্থ স্বামীর হাতে পড়ত! ব্যর্থ হয়ে যেত এমন অমূল্য একটি জীবন! মেয়েটাকে বাঁচিয়েছেন তিনি অমন সর্বনাশ থেকে, এই ভেবে গভীর আত্মপ্রসাদে ভরে উঠল তাঁর মন। মনে হলো এই মেয়েটির সেবায় লেগেই তাঁর অজস্র অর্থ সত্যিকারের সার্থকতা লাভ করবে।

সূর্যকান্ত বরাটের পুত্রবধূ হয়ে এলো পদ্মা। বরাটের ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্ট থেকে দশ হাজার টাকা গেল জগমোহন রুদ্রের পকেটে। তারপর থেকে আমি যখন ডাক্তার হয়ে বরাট-বাগানে প্রথম ঢুকলাম তার ভেতর পুরো তিন বছর পার হয়ে গেছে।

"গত দু'বছর ধরে প্রতিদিন আশা করছি শুনতে পাবো ওদের কুমার-সম্ভবের খবর।" বললেন সূর্যকান্ত। "কিন্তু আমার সব প্রতীক্ষা ব্যর্থ হয়েই চলেছে। এদিকে ওদের একেবারেই খেয়াল নেই। দুটিতে দিন রাত আছে শুধু আর্ট নিয়ে। কুক্ষণে ওদের স্টুডিও বানিয়ে দিয়েছিলাম আমি। বরাট বংশের নতুন প্রদীপ জ্বালবে না নবকান্ত,

বরাট বংশ রক্ষা পাবে না, এ আমার সইবে না, ডাক্তার। বিহিত একটা তোমাকে করতেই হবে। ওদের দুজনকে তুমি একটু—"

আমি বললাম "নিশ্চয় দেখব। কিন্তু বরাট বংশ চালু রাখবার জন্যে আপনি এত ব্যস্ত কেন? আপনিই তো বলেছেন বরাট আপনাকে জন্ম দেননি।"

হাসলেন সূর্যকান্ত, যেন শিশুর মুখে কোনো শিশুসুলভ বুলি শুনে। বললেন "জন্ম দেওয়াটা তেমন শক্ত কাজ নয় ডাক্তার, শক্ত হচ্ছে জন্ম নেওয়া। মাসের পর মাস অন্ধকার খুপরির ভেতর আটকে থেকে, তারপর একদিন বেরিয়ে এসে অন্ধকার অভ্যস্ত চোখে হঠাৎ আলোর ধাক্কা খেয়ে ককিয়ে কেঁদে ওঠা। কেঁদে ওঠাটাই তো দস্তুর। কি বলো ডাক্তার?"

"হ্যাঁ, নবজাতকের কাঁদাটাই দস্তুর।"

"কিন্তু এই দস্তুরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল নবকান্ত। ভূমিষ্ঠ হয়ে সে কাঁদেনি। কাঁদে না, কিছুতেই কাঁদে না। তখন সবাই বললে—সর্বনাশ, কাঁদে না যে! শিগ্‌গির কাঁদাও। দুনিয়ার এই দস্তুর, ডাক্তার, দুনিয়া ব্যতিক্রমদের বরদাস্ত করতে চায় না, তাদের দুরমুশ করে এক ছাঁচে ঢালাই করে ফেলতে চায়। প্রতিভারা হচ্ছে এই ব্যতিক্রম, প্রতিভা মানেই বিদ্রোহ। তাই জন্মেই বিদ্রোহ করলে নবকান্ত। কাঁদলে না। শেষটায় সবাই মিলে অনেক কায়দা করে তাকে কাঁদালে।"

আমি বললাম "এক্ষেত্রেও হয়তো ওর প্রতিভা কাজ করছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বজায় রেখে চলেছে নবকান্ত।"

"সেই বিদ্রোহ ডাক্তারী কায়দায় দমাতে হবে তোমাকে, ডাক্তার।" ব্যাকুল মিনতির সুরে বললেন সূর্যকান্ত।

কিন্তু দুটির ভেতর একটি রঙিন মাছের অতি-সাম্প্রতিক মৃত্যুতে একটি অশুভ ইঙ্গিতের ভয় করছিলেন সূর্যকান্ত। বললেন "ওদের

ছুটিতে দেখেছিলাম আশ্চর্য মিল, এ ওকে ছেড়ে এক মুহূর্ত থাকতে পারে না। ওদের কথা ভেবেই আমিয়েছিলাম এই মৎস্য-দম্পতিকে—ভাবতাম একটি নবকান্ত, একটি পদ্মা। ছুটিই হুবহু এক রকম, তাই জানিনে কোন্‌টি গেল—নবকান্ত, না পদ্মা? জানিনে এ কিসের ইঙ্গিত, কাকে আমি হারাব—পুত্র, না পুত্রবধূ?"

অভয় দিলাম তাঁকে, কিন্তু মনে মনে খুব অভয় আমি নিজেকেও দিতে পারছিলাম না। বরাট বাগানে আবহাওয়াটা কেমন যেন রহস্যময়, অস্বাভাবিক, অস্বস্তিকর বলে মনে হচ্ছিল।

এবার তাহলে খুলেই বলি। পদ্মাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম বললে কিছুই বলা হয় না। ওর অসামান্য রূপের মাদকতা আমার শিরায় শিরায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল বললে খানিকটা ইঙ্গিত দেওয়া হয়। মনে হতে লাগল পদ্মার জন্য আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু অনায়াসে ত্যাগ করতে পারি। পৃথিবীতে অনেক বাঁদরের গলায় অনেক মুক্তোর হার দোলে, কিন্তু নবকান্তর পাশে পদ্মাকে দেখে মনে হলো বিখ্যাত এই প্রবাদটির এমন সার্থক, এমন মর্মান্তিক প্রয়োগ জগতে আর কোথাও হয়নি। এতবড় দুঃসহ ট্র্যাজেডিও আমার চোখে আর কখনো পড়েনি। অথচ সূর্যকান্তর নিশ্চিত এবং নিশ্চিন্ত বিশ্বাস এরা দুজনে দুজনকে পেয়ে মর্ত্যে স্বর্গসুখ অনুভব করছে। বিনোদিনীও তাই ভাবতেন কি না বোঝা যেত না তাঁর রহস্যময় চলাফেরা, ভাবভঙ্গী আর কথাবার্তা থেকে। পদ্মার প্রতি আমার দুর্বার আকর্ষণ, তার সম্বন্ধে আমার গভীর দুর্বলতা পাছে কোনো অসতর্ক মুহূর্তে বা ক্ষণিকের ভুলে ধরা পড়ে যায় বিনোদিনীর অভিজ্ঞ মেয়েলী চোখে, সেই ভয়ে ভীত থাকতাম আমি।

সূর্যকান্তর দিক থেকে আমার কোনো ভয় ছিল না। তিনি জানতেন আমি শুধু ডাক্তার; ডাক্তার যে শুধুই ডাক্তার নয়, রক্ত মাংসের মানুষও

বটে, এই সোজা কথাটা সোজা বলেই বোধকরি তাঁর খেয়াল এড়িয়ে যেতো। তাঁর ধারণা মানুষের হৃদয় আমার কাছে শুধু স্টেথোস্কোপের খোরাক, রক্ত চলাচলের প্রাণকেন্দ্র। তাঁর বিশ্বাস—দেহের কাব্য আমাকে দোলা দেয় না, মানুষের দেহ আমার কাছে শুধু বিভিন্ন রোগ সম্ভাবনার তীর্থভূমি, অথবা নানারকম মিক্‌স্‌চার, প্রলেপ আর ইন্‌জেক্‌শনের প্রয়োগ-ক্ষেত্র।

আর নবকান্ত? ইংরেজিতে যাকে বলে ইডিঅট, সে ছিল ঠিক তাই। মহামূর্খ বা জড়ভরত বললে হয়তো ওর খানিকটা বর্ণনা হয়। পদ্মার সান্নিধ্যে তো বটেই, এমন কি তার কণ্ঠস্বর বা পায়ের ধ্বনি শুনলেও যে আমার দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু চঞ্চল হয়ে ওঠে, জাগরণের প্রায় প্রতিটি মুহূর্তেই যে আমি পদ্মার কথাই ভাবি, এ কল্পনা করার মতো চিন্তাশক্তিও তার ছিল না। স্টুডিওতে এখানে ওখানে সাজানো আর এলোমেলো ছড়ানো তার আঁকা অর্থহীন উদ্ভট ছবি দেখে একবার উচ্ছ্বসিত প্রশংসার ভান করতেই কৃতজ্ঞতায় গলে গিয়ে আমার একান্ত বশংবদ ভক্ত হয়ে উঠল নবকান্ত। আমার আর পদ্মার মেলামেশায় বাধা না থাকলে যে তার পক্ষে সেটা কোনোরকমেও ক্ষতিকর হতে পারে, এ সন্দেহ তার মনে জাগেনি। তা ছাড়া শরীরের কিছু কিছু অস্বস্তিকর আর বেদনাদায়ক উপসর্গ আমার চিকিৎসায় দ্রুত নিরাময় হওয়ায় সে আমার প্রতিভা-মুগ্ধও হয়ে পড়ল।

আশ্চর্যের বিষয়, নবকান্তর প্রতি পদ্মার আচরণে ব্যবহারে হাবভাবে কখনো এতটুকু হেলা অশ্রদ্ধা বা অপ্রেম প্রকাশ পেতো না। কিন্তু আমার মনে হতো—অসম্ভব, পদ্মার মতো মেয়ে নবকান্তর মতো স্বামী পেয়ে কখনোই সুখী হতে পারে না। এ তার অভিনয়, মর্মান্তিক অভিনয়। নিষ্ঠুর বিধাতার ওপর এ তার প্রতিশোধ নেবার কৌশল মাত্র।

তেমনি ধরে নানা কারণে একটি সন্দেহ আমার মনে ঘনীভূত হয়ে

উঠেছিল : দ্রুতবেগে আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠছে পদ্মা, আর আমার প্রতি আকর্ষণ যত বেশী দুর্বার হয়ে উঠছে, পতিপ্রেমের অভিনয় তত বেশী জোরালো করে তুলবার চেষ্টায় সে মরিয়া হয়ে উঠেছে। এবং এ ব্যাপার দেখছেন বুঝছেন বিনোদিনী, কিন্তু কোনো এক রহস্যময় কারণে তিনি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত রয়েছেন, কোনোরকম বাধা দেবার প্রয়োজন বোধ বা চেষ্টা করছেন না।

স্টুডিওতে যেন মরিয়া হয়ে ছবির পর ছবি এঁকে চলেছে নবকান্ত, যেন মস্ত এক দামী কনট্রাক্ট নিয়ে ফেলেছে—নির্ধারিত সময়ের ভেতর বহুসংখ্যক ছবি এঁকে দিতে হবে। সবগুলো ছবিতে মডেল হতে হচ্ছে পদ্মাকে। অতি পরিশ্রমে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল নবকান্ত। শুরু হলো বিভিন্ন উপসর্গ, তাদের ভেতর মাঝে মাঝে প্রলাপ বকাও একটি। শুরু হলো ডাক্তারী দায়িত্ব। অসুস্থতার উপসর্গগুলো শুধু দেহের নয়, মনেরও বটে। মনে হলো অনেক কথা জমে আছে ওর বুকের ভেতর, আমাকে একান্তে বলে বুক হালকা করে ফেলতে না পারলে সে স্বস্তি পাচ্ছে না।

একা ঘরে নবকান্ত আর আমি, তখন বললাম "কি বলবে বলো, নবকান্ত।"

"প্রশ্ন করব। সত্যি জবাব দেবেন ডাক্তারবাবু। আমি সইতে পারব।" বললে নবকান্ত।

চমকে উঠলাম ওর নতুন সুরে, ওর অসামান্য দৃঢ়তায়। এ এক সম্পূর্ণ আলাদা নবকান্ত। একে ফাঁকি দেওয়া চলবে না, দেবার প্রয়োজনও নেই। বললাম "বলো, সত্যি জবাব দেবো।"

"আমাদের বরাট বংশের নতুন বংশধর আজো এলো না—বাবা যার পথ চেয়ে বসে আছেন। হয়তো পদ্মাও।" ধীরে ধীরে বললে নবকান্ত।
"কেন ?"

নবকান্তকে আমি পরীক্ষা করেছিলাম। যে অপ্রিয় সত্য আবিষ্কার

করেছিলাম তা নিজের মনেই গোপন রেখেছিলাম। এবার বললাম "কোনদিনই সে আসবে না, নবকান্ত। কারণ তোমার ভেতরে তার বীজ নেই।"

নীরব রইল নবকান্ত। মনে হলো এমনি একটা সন্দেহ তারও মনে জেগেছিল ; আমার কথায় শুধু তার সত্যতার যাচাই হয়ে গেল।

"সব মেয়েই সন্তান চায়—তাই না, ডাক্তারবাবু?" প্রশ্ন করল সে।

বললাম "সব মেয়েই চায় কিনা জানিনে। কিন্তু চাওয়াটাই স্বাভাবিক।"

"বাবার সব হিসেবেই ভুল হয়ে গেল, ডাক্তারবাবু।" বললে নবকান্ত। "পদ্মার জীবনটা আমারি জন্যে নষ্ট হয়ে গেল। আমি ওকে ব্যর্থ করে দিলাম!"

আমি প্রবোধ দিতে চেষ্টা করে বললাম "না না, নবকান্ত। তুমি কি দেখতে পাও না পদ্মা তোমাকে কত—"

"পাই।" বললে নবকান্ত। "সেইজন্যেই তো দুঃখ। আমি ওর উপযুক্ত নই, তবু সে আমাকে ঘৃণা করে না, তুচ্ছ করে না। ওর সঙ্গে আমি কতবার জানোয়ারের মতো ব্যবহার করেছি, একটিবারও সে রাগ করেনি। এ আমি অনেক সয়েছি, ডাক্তারবাবু, আর আমি সইতে পারছিনে।"

নবকান্ত বলতে লাগল "বাবার বড় বিশ্বাস আমার শিল্প-প্রতিভা অসামান্য। বাবার সে কথা আমি বিশ্বাস করতাম, ডাক্তারবাবু। স্টুডিওতে তাই আপন খেয়াল খুশি মতো ছবি এঁকে গেছি। তারপর পেলাম পদ্মাকে। পদ্মার চাইতে সুন্দর পৃথিবীতে আর কিছু নেই, ছিল না, হতে পারে না, ডাক্তারবাবু। পদ্মা ক্লান্ত হয়নি, বিরক্ত হয়নি, রাগ করেনি। ঐসব ছবির ভেতর আমি পদ্মাকেই দেখতে পেতাম নানা ভাবে, নানা ভঙ্গীতে। তাই নিজের আঁকা সে সব ছবি দেখে নিজেই আমি মুগ্ধ হতাম। ভাবতাম একদিন পৃথিবীর লোক তেমনি

মুগ্ধ হবে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি পৃথিবীর লোক উপহাস করবে, তারা তো আমার চোখ দিয়ে দেখবে না। আমার ঐ ছবিগুলো সব যেন পুড়িয়ে ফেলা হয়, ডাক্তারবাবু।"

তারপর একটু থেমে, একটু ভেবে বললে "না না, পদ্মাকে দেখে দেখে আঁকা ছবিগুলো—ওরা বেঁচে থাক।"

অসুখ বেড়ে চলল নবকান্তর। বাড়তি রোধ করবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হতে লাগল। মনে হলো যেন এবারে মরবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে সে, কিছুতেই তাকে আর বাঁচানো যাবে না। সে আমার অপরাধী মনের কল্পনা কি না জানি না, কিন্তু মনে হলো 'ইডিঅট' নবকান্তর চোখে যেন গভীর অন্তর্দৃষ্টি এসেছে, আর সে দেখতে পাচ্ছে আমার মনের অন্দরমহল। সোজা ভাষায় বলি, আমার মনের কোণে উঁকি দিয়েছিল একটি সম্ভাবনার ছবি—সে ছবিতে পদ্মা আর আমার মধ্যবর্তী বাধা ঘুচিয়ে দিয়ে পদ্মাকে মুক্তি দিয়ে চিরতরে সরে গেছে নবকান্ত, আর পদ্মা এসে দাঁড়িয়েছে আমার হাত ধরে, নতুন জীবনের যাত্রাপথে।

আমাদের দুজনের পথ পরিষ্কার করে দিয়ে চলে যাবে বলেই যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে নবকান্ত। পদ্মার জীবন ব্যর্থ করে বেঁচে থাকবে না সে, পদ্মার জীবন ফুলে ফলে সার্থক করবার জন্যে সে মরবে। তার মৃত্যুতে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু ডাক্তারী বিবেক এড়ানো গেল না। আমার চাইতেও বড় ডাক্তারের পরামর্শও নেবার ব্যবস্থা করলাম।

কিন্তু বাঁচানো গেল না। শেষ পর্যন্ত মরে গেল নবকান্ত। হনলুলু থেকে আনা দুটি রঙিন মাছের একটির মৃত্যুতে সূর্যকান্ত অমঙ্গল আশঙ্কা করেছিলেন, সে-আশঙ্কা সত্যে পরিণত হলো।

ভেবেছিলাম চিৎকার করে কেঁদে উঠবেন সূর্যকান্ত অধীর হয়ে। কিন্তু অসীম তাঁর ধৈর্য। হিমালয়ের মতো স্থির, অচঞ্চল; গাম্ভীর

সূর্যকান্ত। শুধু বললেন "বরাট বংশের শেষ বাতি নিবে গেল। যাবার আগে জ্বালিয়ে রেখে গেল না নতুন বাতি। তবু দুঃখ করে তাঁর আত্মাকে দুঃখ দেবো না, ডাক্তার। সব দুঃখ ভুলে থাক সে অনন্ত আনন্দধামে।"

সত্যটা তাঁর কাছে তারপর ধীরে ধীরে প্রকাশ করলাম। বললাম নতুন জীবনের বীজ ছিল না নবকান্তর দেহে। বরাট বংশকে নতুন বংশধর দিতে কোনো দিনই সে পারত না। শুনে চমকে উঠলেন সূর্যকান্ত। আমার একটি কথায় তাঁর অনেক দিনের বড় আদরের একটি ভুল যেন এক নিমেষে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

"ভুল, ভুল—আগাগোড়াই হয়তো আমার ভুল, ডাক্তার।" বললেন তিনি। "একটি জগদ্ধাত্রী মেয়েকে সুখী করতে চেয়েছিলাম। হয়তো উলটে তার জীবনটাকে ব্যর্থই করে দিলাম। অন্ধ দম্ভ জেগেছিল আমার মনে, সেই দম্ভের মাশুল দিলে একটা ফুলের মতো মেয়ে। ···আর একটা কথা, ডাক্তার। নবকান্ত আমায় বলে গেছে 'পদ্মা এতদিন বন্দিনী ছিল। তাকে আমি মুক্তি দিয়ে গেলাম। তুমি তাকে মুক্তপাখীর মতো স্বাধীন ডানা মেলে উড়তে দিয়ো, বাবা। তাকে আমি সুখী করতে পারিনি, সে সুখী হোক। তার প্রাণের কোনো আশা, কোনো আকাঙ্ক্ষাই যেন অপূর্ণ না থাকে। এই আমার শেষ অনুরোধ।' কথাগুলো ডেলিরিআমের মতো সে বলেছিল বটে, কিন্তু এ তো ডেলিরিআম নয়, ডাক্তার।"

নীরব রইলাম আমি।

নেশাগ্রস্তের মতো সূর্যকান্ত বলে চললেন "আমার জীবনেও এক-কালে বসন্তের মরশুম এসেছিল, ডাক্তার। আমি জানি ওর রূপ, ওর মর্ম, ওর ধর্ম। পদ্মার জীবনে এসেছে তারি জোয়ার, সেই পরম লগ্ন। তাকে কে ব্যর্থ করবে, কোন্ অধিকারে? সবার উপরে জীবন সত্য, ডাক্তার। জীবনকে শুকিয়ে রেখে নিয়মের মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজিয়ে কি হবে?"

আমাকে বিস্মিত করেছিল নবকান্ত, এবারে বিস্মিত করলেন সূর্যকান্ত। আমি প্রশ্ন করলাম "আপনি বলতে চাইছেন পদ্মা যদি এবারে দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করে তাতে আপনার কোনো আপত্তি হবে না?"

সূর্যকান্ত বললেন "সেই কথাই তো বলতে চাইছি, ডাক্তার। নবকান্তর শেষ কথায় তো তারই ইঙ্গিত। পদ্মার জীবন তৃপ্তিতে ভরে উঠলে নবকান্তর আত্মা তৃপ্তি পাবে।"

কথাটা অবিশ্বাস হলো না। নবকান্তকে যেন নতুন রূপে দেখতে পাচ্ছিলাম আমি।

"পিতৃস্নেহের অন্ধতায় ভুলে হয়তো মেয়েটার প্রতি অবিচারই করে ফেলেছিলাম।" বললেন সূর্যকান্ত। "এবার সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কিন্তু এখনই নয়। শ্রাদ্ধশান্তিটা চুকে যাক, তারপর আমি নিজেই বৌমাকে···হ্যাঁ, এখন পর্যন্ত পদ্মা আমার বৌমা বইকি।"

আমাকে ছাড়তে রাজী হলেন না সূর্যকান্ত। বললেন "তুমি তো শুধু নবকান্তর জন্যে ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান হয়ে আসনি ডাক্তার, যে সে চলে গেছে বলেই তুমিও চলে যাবে। আমাদের দেখাশোনা করবে কে?"

বলা বাহুল্য, আমার সারা অন্তরও থাকবার জন্যেই উদগ্র হয়েছিল। পদ্মার সান্নিধ্য ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে সহজ ছিল না।

নবকান্ত যেন মরে গিয়ে বৃহত্তর মহত্তর হয়ে উঠল। বরাট বাড়ির সবারই পরম তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠল তার স্টুডিয়ো। যখন তখন সেখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন সূর্যকান্ত, স্বর্গীয় পুত্রের এঁকে রেখে যাওয়া ছবিগুলো দেখে। ঘুরে বেড়াতে লাগলেন বিনোদিনীও; স্বর্গীয় শিল্পী নবকান্ত বরাটকে, মা না হয়েও, তিনিই একরকম মানুষ করেছিলেন। আমিও যেন ঘুরে ঘুরে ছবিগুলো দেখতে দেখতে তাঁদের ভেতর নতুন আলোর আভাস পেলাম। আর পদ্মা? সে বোধকরি দিন রাত্রির

অধিকাংশ সময়ই কাটাত স্টুডিয়োতে। বিধবার বেশ পরেনি সে। হয়তো নিষেধ ছিল সূর্যকান্তর। হয়তো নবকান্তরও। শৌখিন সরু শাঁখা ভেঙে ফেলে দেয়নি হাত থেকে। শোকচিহ্ন হিসেবে বাদ দিয়েছিল শুধু সিঁথিতে সিঁদুর। অদৃশ্য হয়নি ললাটের লাল টিপ।

অকাল মৃত্যুর জন্যে মনে মনে নবকান্তকে ধন্যবাদ দিয়ে অধীরভাবে দিন রাত কাটাতে লাগলাম, পদ্মা আর আমার মাঝখানে শোভন দূরত্ব বজায় রেখে। ব্যবধান অনেক দিন সয়ে থাকা গেছে, এখন আর কটা দন মাত্র।

যথাসময়ে চুকে গেল শ্রাদ্ধশান্তির ব্যাপার। তাতে ছিল গভীর আন্তরিকতা, ছিল না আড়ম্বরের ঘটা। আর সেই উপলক্ষে নবকান্তর আত্মার তৃপ্তির জন্যে জনকল্যাণের কাজে একটা মোটা টাকা দান করে দিলেন সূর্যকান্ত।

পরদিন স্টুডিয়োতে পশ্চিম জানালার ধারে একা বসে ছিল পদ্মা। তন্ময় হয়ে দেখছিল ঈজেলের ওপর রাখা একটি ছবি। নবকান্ত এ ছবি এঁকেছিল পদ্মাকেই মডেল করে; ছবির সঙ্গে আসলের কোথায় মিল আছে খুঁজে বার করা সহজ নয়। সূর্যাস্তের শেষ আলোয় পদ্মাকে দেখে মনে হলো বিশ্বের সমস্ত মাধুর্য যেন এক হয়ে এসে মিশেছে পদ্মায়।

পদ্মাকে জানালাম আমার ভিক্ষা। বললাম "পদ্মা, এবার আমাকে গ্রহণ করো তুমি। এখন তো আর কোনো বাধা নেই।"

ভেবেছিলাম পদ্মা রাজী হবে, আগ্রহে আকুল হয়ে উঠবে। কিন্তু পদ্মা শুধু বললে "তা হয় না ডাক্তারবাবু।"

চমকে উঠলাম বিষণ্ণ বিস্ময়ে। আহত স্বরে বললাম "যদি তোমায় ভুল বুঝে থাকি তাহলে মার্জনা করো। কিন্তু পদ্মা, সত্যি করে বলো, আমাকে কি তোমার ভালো লাগে না, কখনো লাগেনি?"

আত্মহারা হয়ে পদ্মার হাত ধরতে গেলাম। রূঢ়ভাবে নয়,

আশ্চর্য শোভন ভঙ্গীতে অনায়াসে হাত সরিয়ে নিয়ে গেল পদ্মা। অশোভন অসংযমের গভীর লজ্জায় ফিরিয়ে নিয়ে এলাম আমার সসম্মানে প্রত্যাখ্যাত হাতখানা।

খানিকক্ষণ নীরব থেকে সাহস সঞ্চয় করেই যেন পদ্মা বললে "মিছে কথা আমি কখনোই বলিনে, ডাক্তারবাবু। আর আমার স্বামীর প্রিয় স্টুডিয়োর এই পুণ্যতীর্থে বসে মিছে কথা মনে আনাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনাকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। কুমারী জীবনে যে সোনার রাজকুমারের স্বপ্ন দেখতাম, আপনাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল আপনি আমার সেই সোনার রাজকুমার, এসেছেন বন্দিনী আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে। আপনাকে যত দেখতাম তত বেশী ভালো লাগত। আপনাকে কোনো ছলে একটিবার দেখবার জন্য, আপনার কণ্ঠস্বর একটু শুনবার জন্য আমি প্রতিটি মুহূর্ত ব্যাকুল হয়ে থাকতাম। এক এক সময় মনে হতো আমি বুঝি পাগল হয়ে যাবো। পাছে ধরা পড়ে যাই এই ভয়ে, আপনার জন্যে মনপ্রাণ যত বেশী আকুল হয়ে উঠত ততই বেশী মরিয়া হয়ে স্বামীর প্রতি মনোযোগ দেবার চেষ্টা করতাম। তখন যদি আপনি হাত বাড়িয়ে আমায় বলতেন 'চলো', আমি হয়তো অনায়াসে বিনা দ্বিধায় আপনার সঙ্গে চলে যেতে পারতাম। ভয় করতাম না কাউকে, কিছুকে। কিন্তু এখন—"

"এখন তো কোনো বাঁধা নেই পদ্মা। নবকান্ত তো তোমায় মুক্তি দিয়ে গেছে।"

"সেই মুক্তিই তো আমার সবচেয়ে বড় বন্ধন, ডাক্তারবাবু! সেই মুক্তির আলোতেই তাঁকে আমি নতুন রূপে দেখতে পেয়েছি। আজীবন আমি তাঁকে শুধু ঘৃণা আর অমর্যাদাই করে এসেছি অতিশ্রদ্ধা আর অতিমর্যাদায় ভুল করে। বাইরের রূপ তার ছিল না বলে তার প্রতি বিরূপ হয়েছিলাম, দেখতে পাইনি তার অন্তরের রূপ, যে অন্তর দিয়ে

আমায় তিনি ভালবেসেছিলেন। সে ভালবাসার তুলনা নেই, ডাক্তারবাবু।"

আমি বলিলাম "কিন্তু পদ্মা, তোমার শিল্পী প্রতিভাকে শুধু চেপেই রেখেছিল নবকান্ত, পাছে তুমি তাকে ছাপিয়ে ওঠো। একি ভালবাসা, না স্বার্থপরতা?"

"ভালবাসা যত বেশী গভীর, তত বেশী স্বার্থপর, ডাক্তারবাবু।" বললে পদ্মা। "আমার কাছে আমার স্বামী-ই শিল্পের চাইতে বেশী বড় হয়ে থাকবেন, এই ছিল তার ভালবাসার দাবি। পাছে আমার শিল্প সাধনাই আমার কাছে ওঁর চাইতে বেশী বড় হয়ে ওঠে, এই ছিল তাঁর ভয়। আমাকে হারাবার ভয়। এ ভয় তো ভালবাসা থেকেই আসে, ডাক্তারবাবু।"

বুঝলাম তর্ক করা বৃথা হবে। নবকান্তকে মহীয়ান করে তুলেছে মৃত্যুর জাদু। তবু একবার শেষ চেষ্টা করে বললাম "শুধু একটা স্মৃতি নিয়ে নিজের জীবনটাকে ব্যর্থ করে দেবে পদ্মা?"

"ব্যর্থ করব না, ডাক্তারবাবু। সার্থক করে তুলব বাকী জীবনটা শিল্পের সাধনায় কাটিয়ে। শিল্পী বাপের মেয়ে, শিল্পী স্বামীর স্ত্রী আমি। শিল্প জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে তাঁদের সম্মান রাখাই হবে আমার জীবনের সাধনা।"

"আমার জীবনটাকে সার্থক করেও তোমার সে সাধনা সফল হতে পারত, পদ্মা। আমিও শিল্পচর্চ্চার ভক্ত। তোমার সাধনার পথে বাধা হতাম না। আমার কথাটা কি একবারও ভাববে না তুমি?"

পদ্মা হেসে বললে "ভেবেছি বইকি। আমার মালা পেলেন না বলে কণ্ঠ আপনার শূন্য থাকবে না, ডাক্তারবাবু। আপনার গলায় মালা দোলাতে পেলে নিজেকে ধন্য মনে করবে না এমন মেয়ে বাংলাদেশে খুব বেশী নেই।"

বলেই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল পদ্মা। বুঝলাম তার চরম কথা বলা

হয়ে গেছে, এ বিষয়ে আর আলোচনা চলবে না।

গম্ভীর স্বরে সে বললে "একটা বিনীত অনুরোধ আছে আপনার কাছে। আপনি আর এ বাড়িতে থাকবেন না। আমার কাছ থেকে আপনি দয়া করে দূরে চলে যান। আপনি কাছাকাছি থাকলে আমার শুধু দুঃখই বাড়বে। আর আমাকে দুঃখ দিয়ে আশা করি আপনিও তৃপ্তি পাবেন না। রাখবেন আমার অনুরোধ?"

বললাম "রাখব, পদ্মা! আজই আমি চলে যাবো। কিন্তু মাঝে মাঝে কি দেখা হবে না?"

"দৈবাতের কথা কিছু বলা যায় না। কিন্তু দেখা আর না হওয়াই ভালো, ডাক্তারবাবু।"

সেদিনই বিদায় নিলাম সূর্যকান্ত বরাটের কাছ থেকে। "হঠাৎ এ মতি কেন ডাক্তার?" বললেন তিনি।

"হঠাৎ নয়, সূর্যবাবু। কয়েকদিন থেকেই ভাবছিলাম।" বললাম আমি। "নবকান্তর জন্যেই এসেছিলাম। নবকান্ত নেই,—চললাম—"

বরাট বাড়ির গাড়ি বেরুলো গ্যারাজ থেকে। বিদায় নিয়ে উঠে বসলাম। গাড়ি স্টার্ট দেবার আগে সূর্যকান্ত বললেন "ঘরে তোমাকে রাখতে পারলাম না, কিন্তু দরকার হলেই ফোন করব, গাড়ি পাঠাব, ডাক্তার।"

বললাম "অন্য ডাক্তার পাঠিয়ে দেবো। আমায় ক্ষমা করতে হবে, সূর্যবাবু। নবকান্তহীন বরাট বাগানে আমাকে আর আসতে বলবেন না।"

সূর্যকান্ত বরাটকে চোখ মুছতে কখনো দেখিনি। এইবার দেখলাম।

গাড়ি রওনা হল বরাট বাগান ছাড়িয়ে লম্বা ফাঁকা রাস্তার ওপর দিয়ে। পেছন দিকে তাকিয়ে দেখলাম বাগান বাড়ির দোতলায়

স্টুডিয়োর জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছে পল্লা, এদিকেই নিবদ্ধ তার

বিদায়, শকুন্তলা স্যানাটোরিআম!

বিদায় নিয়ে আসিনি ডাক্তার ত্রিপাঠী বা শেঠজীর কাছ থেকে; পালিয়ে এসেছি চুপি চুপি সবার অলক্ষ্যে, ঝিরি ঝিরি বর্ষণমুখর ঝাপ্‌সা সন্ধ্যার অন্ধকারে।

ট্রেন ছুটছে। দ্রুতবেগে দূরে, আরো দূরে সরে যাচ্ছি শকুন্তলা স্যানাটোরিআম থেকে। ট্রেনের চাকাগুলো বিচিত্র সংগীত জাগাচ্ছে লাইনের ওপরে। সেই আওয়াজ শুনতে শুনতে মনে পড়ছে শেঠজীর সঙ্গে বসে বেতারে শুনেছিলাম ওস্তাদ মকবুল হোসেনের শানাই বাজানো। এখন বাজছে না ওস্তাদ মকবুল হোসেনের শানাই। তবু তার তিলক কামোদ রাগিণীর ঝংকার যেন এখনও কানের পর্দায় কাঁপছে। আর কাঁদছে। এমন মিঠে তিলক কামোদ যে শোনার মত শুনতে পেলে কান্না পায়।

মকবুল হোসেনের তিলক কামোদ বাজানোর কথা মনে করে দু জন গাইয়ের তিলক কামোদ গাওয়ার কথা মনে পড়ে গেল।

তাঁদের এক জন ছিলেন আমাদের পাড়ার গগন খাজাঞ্চি। দিদিমার একমাত্র নাতি; মরবার আগেই নাতিকে দিদিমা তাঁর বেশ কিছু নগদ টাকা আর বসত-বাড়িখানা দানপত্র করে দিয়ে গিয়েছিলেন। বিয়ে-থা করেন নি গগন খাজাঞ্চি, গান চর্চার ব্যাঘাত ঘটবে বলে।

দিদিমা মারা গেলে পর বাড়ির একতলাটা ভাড়া দিয়ে দোতলায় একা থাকতে লাগলেন গগন খাজাঞ্চি। দিদিমা-হীনতায় তাঁর বরং সুবিধাই হল গান চর্চার। বাড়ির উলটো দিকে একটা ছোট্ট হোটেল ছিল, তার নাম "ভোজন-ভারতী"। সেই ভোজন-ভারতী থেকে

দু বেলা ভাত মাছ ডাল তরকারি আসত, আর ভোরে বিকেলে চা আর টোস্ট আসত ঐ হোটেলেরই রেস্তোরাঁ বিভাগ থেকে। সুতরাং বাড়িতে ওসবের কোন হাঙ্গামাই ছিল না, ঝামেলার ভেতর মাসের শেষে বিল চুকিয়ে দেওয়া। তার জন্যে চেক-বই ছিল, তা থেকে চেক কেটে সই করে দিলেই হল।

অনেক দিন ধরেই আমাদের পাড়ায় "গাইয়ে" নামে তিনি এক ডাকে বিখ্যাত। পাড়ায় যখনই বারোয়ারী উৎসব কিছু হত—বিশেষ করে পুজোর সময়—আমাদের বিচিত্রানুষ্ঠানে গান গাইতেন গগন খাজাঞ্চি। তবলা, তানপুরো, হারমোনিয়াম সব তাঁর নিজের। এগুলো যাঁরা বাজাতেন তাঁরাও তাঁর নিজের লোক, পয়সা-কড়ি কিছু দিতে হলে তিনি নিজেই দিতেন।

আমাদের পাড়ার নিমাই হালদার ছিলেন কালোয়াতি গানের বড় সমঝদার। তাঁর বাড়িতেও মাঝে মাঝে গানের আসর বসত। গাইতেন গগন খাজাঞ্চি। আরও অনেক গাইয়ে।

তিলক কামোদ রাগিণীটাই তাঁর বেশী রপ্ত ছিল। চোখ বুজে গাইতেন "নীর ভরন ক্যায়সে জাউঁ সখিরি"—ওগো সখি, কেমন করে জলের ঘাটে জল ভরতে যাব, পথের মাঝে যে শ্যাম নটবর ভারি নট-ঘট শুরু করেছে, ইত্যাদি।

এ গান যখনই শুনতেন গগন খাজাঞ্চির মুখে, নিমাই হালদার বলতেন, "আহা, এমন গান আর হয় না। বলিহারি, বলিহারি গগন, বলিহারি। চক্রপাণি ভট্টচার্যির কাছে তালিম পেয়েছিলে বটে।"

কিন্তু পাড়ার আর সবার মতে নিমাই হালদারের এ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি। তাঁদের মতে গগন খাজাঞ্চি যে একেবারে যাচ্ছেতাই গাইয়ে তা অবশ্য নয়, কিন্তু তাঁকে এমন কিছু আহা মরি গাইয়েও বলা যায় না। বড় জোর চলনসই। তা ছাড়া নেহাত পাড়ার লোক বলেই খাতির করে তাঁর গান শোনা, নইলে তার গান শোনবার মত তেমন আর কি?

সেবার পাড়ার বারোয়ারী সরস্বতী পুজোয় বেশ ভাল চাঁদা উঠল। ঠিক হল গানের জলসা করা হবে তু দিন—এক দিন হবে ক্ল্যাসিক্যাল মানে উচ্চাঙ্গ গান, অন্য দিন মডার্ন অর্থাৎ আধুনিক গান। বিখ্যাত খেয়াল আর ঠুংরি গাইয়ে ওস্তাদ সিকান্দার খাঁ সাহেবের ভাইপো জুল্‌ফিকার খাঁ তখন এ শহরে রয়েছেন। বয়স তাঁর তেমন বেশী নয়, কিন্তু ওস্তাদী নাম ডাক বেশী। আমাদের পুজো কমিটির আমোদ-প্রমোদ শাখার সম্পাদক নীলাদ্রি দস্তিদার বললেন "এবারের আসরে ওস্তাদ জুলফিকার খাঁকে আনা দরকার। তুর্দান্ত গাইছে আজকাল। দক্ষিণাও বেশী নয়, মাত্র তিন শ টাকা। ওর মত গুণীর পক্ষে এ কিছু নয়।"

"তা হলে আমাদের গগন খাজাঞ্চি কি দোষ করলে? তাকেও দক্ষিণা দাও।" বললেন তু-এক জন গগন-দরদী।

"আচ্ছা, সে যথাসময়ে দেখা যাবে।" বললেন নীলাদ্রি দস্তিদার। শুনে বোঝা গেল আচ্ছাও নয়, যথাসময়ে ভেবে দেখাও হয়ে উঠবে না।

তা যাই হোক, গানের রাত্রে দলবলসহ এলেন তরুণ ওস্তাদ জুলফিকার খাঁ। বিখ্যাত কালোয়াতি জাতুকর সিকান্দার খাঁর ভাইপো। তিন শ টাকা তিনি আগাম নিয়ে নিলেন। তারপর গান ধরলেন। তু ঘন্টা গেয়ে উঠে পড়লেন তরুণ খাঁ সাহেব। আরেক জায়গায় গাইতে হবে, সেখান থেকেও আগাম টাকা নিয়ে রেখেছেন।

খাঁ সাহেব উঠে যাবার পর গাইতে বসলেন আমাদের পাড়ার গাইয়ে গগন খাজাঞ্চি। শ্রোতাদের বেশির ভাগ উঠে যেতে চাইছিলেন। অনেক করে তাঁদের বসানো হল। বিরক্ত মুখে নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে বসলেন তাঁরা। বললেন "খাঁ সাহেবের গানের পর গগন খাজাঞ্চির গান! কিসের পরে কি!"

জমল না। জমল না গগন খাজাঞ্চির গান। তিনি গাইলেন তিলক কামোদ, নিমাই হালদারের ফরমাশ : "নীর ভরন ক্যায়সে

জাউ সখিরি।" শুনতে শুনতে আমার দু চোখ জলে ভরে উঠল।
ঝাপসা চোখে চেয়ে দেখলাম আমারই মত অভিভূত হয়ে উঠেছেন নিমাই হালদার, চোখের জল মুছছেন কোঁচা বুলিয়ে। শুনলাম মাঝে মাঝে বলে উঠছেন "বেঁচে থাকো গগন। এমন গান আর হয় না।"

কিন্তু আসর জমল না। গগন খাজাঞ্চির গান থামতে দেখা গেল আসর তার আগেই চার ভাগের তিন ভাগ ফাঁকা হয়ে গেছে। ওস্তাদ সিকান্দার খাঁ সাহেবের সাক্ষাৎ ভ্রাতুষ্পুত্র জুল্‌ফিকার খাঁর গানের পর চক্রপাণি ভট্টাচার্যের শিষ্য গগন খাজাঞ্চির গান প্রতিবেশীদের ভাল লাগে নি। আলোচনা শোনা গেল: "খাঁ সাহেবী তালিম হল গিয়ে আলাদা চিজ! জুল্‌ফিকারের ধাক্কা গগন সামলাতে পারবে কেন!"

এর কিছু দিন বাদে পাড়ায় আরেকটি আসর বসেছিল গান-বাজনার। জুলফিকার খাঁকে আনা হল। তিনি এবার চাইলেন পাঁচ শ টাকা। অনেক অনুরোধে কমিয়ে আগাম চার শ টাকায় রাজী হলেন। পাড়ার উদ্যোক্তারা গিয়েছিলেন পাড়ার গাইয়ে গগন খাজাঞ্চির কাছে। তিনি বললেন "আমাকে দুশ টাকা দিতে হবে।"

উদ্যোক্তারা বিস্মিত হয়ে বললেন "কি বলছেন আপনি? জুলফিকার খাঁ সাহেব পর্যন্ত মাত্র চার শ টাকায় রাজী হয়েছেন, আর আপনি দু শ টাকা চাইছেন? ক্ষেপে গেলেন না কি?"

"হ্যাঁ, ক্ষেপেই গেলাম। আমাকে গাওয়াতে হলে আগাম দু শ টাকা দিয়ে যান। তা না হলে আসুন, নমস্কার।" বললেন গগন খাজাঞ্চি। ফিরে গেলেন উদ্যোক্তারা খাজাঞ্চির ধৃষ্টতার কথা ভাবতে ভাবতে।

খবরটা পাড়ায় রাষ্ট্র হয়ে গেল। বিপিন চাটুয্যে, সলিল দত্ত, বঙ্কিম ভট্‌চার্যি, দীণেন শাসমল প্রমুখ পাড়ায় যারা গানের সমঝদার বলে খ্যাত, তাঁরা সবাই অবাক হয়ে গেলেন পাড়ার গাইয়ে গগন খাজাঞ্চির আশ্চর্য ধৃষ্টতার কথা ভেবে।

"লোকটার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে।" বললেন তিনকড়ি গাঙ্গুলী। "বামন হয়ে চাঁদের নাগাল পেতে চায়।"

মাথা খারাপ হয়েছিল কিনা জানি না, এর পর শোনা গেল বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে সোজা কাশী চলে যাচ্ছেন গগন খাজাঞ্চি। সেখানেই বিশ্বেশ্বরের চরণে বাকী জীবন কাটিয়ে দেবেন। বাকী জীবন মানে হয় তো অনেক বছর, কারণ গোঁফ আর দাড়ি দুইই রাখতেন বলে বয়স তাঁর একটু বেশী মনে হলেও চল্লিশের খুব বেশী ছিল না।

চলে গেলেন পাড়ার গাইয়ে গগন খাজাঞ্চি। দুঃখ পেলাম আমি—ওঁর ঐ তিলক কামোদের গানখানা আমার কানে বড় ভাল লেগেছিল। নীর ভরন ক্যায়সে জাউঁ—আহা হা!

মন হয় তো নিমাই হালদারেরও খারাপ হয়েছিল, কিন্তু তাই বলে তিনি গান শোনা ছাড়লেন না। জুলফিকার খাঁ ভাল গায়, এ কথা তিনি অস্বীকারও করলেন না। ক্রমে বিপিন চাটুয্যে, সলিল দত্ত, বঙ্কিম ভট্টচার্যি, দীণেন শাস্‌মল—এদের সঙ্গে একমত হয়ে স্বীকার করলেন জুলফিকার খাঁর সঙ্গে গগন খাজাঞ্চির কোন তুলনাই হতে পারে না। নিতান্ত গেঁয়ো যোগী বলেই অ্যাদ্দিন ভিখ্‌ পেয়েছিল।

গগন খাজাঞ্চি চলে যাওয়ার কিছুদিন বাদেই হল নিখিল ভারত বৈজুবাওরা সংগীত সম্মেলন—বিখ্যাত গায়ক ৺বৈজুবাওরার পুণ্য স্মৃতি মাথায় নিয়ে। পাড়ার গান-প্রিয়রা দল বেঁধে গেলাম গান শুনতে। সম্মেলন মাত করে দিলেন এলাহাবাদের সঙ্গীত-সিংহ তোফাজ্জল হুসেন খাঁ সাহেব। যেমন দাপটী, তেমনি লয়দার, তেমনি দরদ-ভরা, তেমনি সুরেলা। তুলনা নেই, তুলনা নেই, তুলনা নেই। রীতিমত গানের জাদুকর। ক্ষণজন্মা পুরুষ।

এক দিন খান বাহাদুর মির্জা আলি সাহেবের বাড়ির চারতলায় আমরা খাঁ সাহেবের সঙ্গে ঘরোয়া মোলাকাৎ করতে গেলাম। খাঁ সাহেব খান্‌ বাহাদুরের অতিথি। আমাদের সঙ্গে ছিলেন আমাদেরই

পাড়ার রায় সাহেব করুণাসিন্ধু মিত্তির। তিনি মির্জা আলি সাহেবের পরম দোস্ত। মির্জা আলিই ব্যবস্থা করেছিলেন খাঁ সাহেবকে যাতে আমরা একান্তে পাই, অন্য লোকের উপস্থিতির বাধা না থাকে।

সংগীত-সিংহ কি কঠোর সাধনা করে তবে সিংহ হয়েছেন তাই তাঁর নিজের মুখে শুনে আমরা মুগ্ধ হলাম। বিদায় নিয়ে আসবার আগে বললেন "আমার এক ভাগনে আছে তার কথা আপনারা হয়তো শুনেছেন।"

"শুনেছি বটে।" বললেন বিপিন চাটুয্যে, যিনি শহরে বা শহরতলীতে ওস্তাদী গানের কোন বড় আসর পারতপক্ষে বাদ দেন না।

"শুনেছি," বললেন বিপিনবাবু, "তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ, প্রকৃতি একটু উদাসী, দিনরাত সুরে ডুবে আছেন, এখনো তাকে আপনি কোথাও বাইরে গাইতে দেন নি, তিনি নিজেও জানেন না তিনি কত বড় গাইয়ে।"

"ঠিক শুনেছেন।" বললেন ওস্তাদ তোফাজ্জল হুসেন খাঁ সাহেব। "গানের দুনিয়া শুধু জানে আমার এক ভাগনে তৈরী হচ্ছে, জানে না কি অদ্ভুত তৈরী হয়েছে। সে যখন আসরে গাইতে নামবে, তখন বড় বড় ওস্তাদের মুখ বিলকুল চুন হয়ে যাবে। আমাকে যদি ওস্তাদ বললেন তো আমার বয়সে ও হবে ওস্তাদের শাহেন্‌শা।"

"কি নাম ওঁর, ওস্তাদ সাহেব?"

"জানতে পারবেন দু-এক বছরের ভেতর।" বললেন ওস্তাদ সাহেব।

এইবারে বলি ওস্তাদ গুরগন খাঁর তিলক কামোদের কথা। একটু আগে থেকেই শুরু করি।

উক্ত ঘটনার প্রায় বছর খানেক বাদে এলাহাবাদে সংগীত সম্মেলন শুনতে চলে গেলেন নিমাই হালদার। সেই সম্মেলনে গাইবেন

ওস্তাদ-সিং তোফাজ্জল হোসেন খাঁ সাহেবও। তাঁর একদিনের গান এলাহাবাদের বেতার থেকে হাওয়ায় ছাড়া হল, আমরা বেতারে শুনলাম আমাদের শহরে বসে।

ফিরে এসে পাড়ার সঙ্গীতমোদী সবাইকে চমক লাগিয়ে দিলেন নিমাই হালদার। ওস্তাদ তোফাজ্জল হুসেন খাঁ সাহেবের সেই আশ্চর্য ভাগনের আশ্চর্য গান শুনে এসেছেন তিনি।

"কি নাম ওঁর?"

"জানি না। যেদিন গান শুনবেন সেদিনই নামও শুনবেন।" বললেন নিমাই হালদার।

"কবে শুনতে পাব ওঁর গান?"

"শীগ্‌গিরই শোনাব। তারও ব্যবস্থা করে এসেছি। আশ্চর্য ভদ্রলোক এই ওস্তাদ তোফাজ্জল হুসেন খাঁ। তার চাইতে বেশি আশ্চর্য ওর ভাগনে। আপনারা গগন খাজাঞ্চির তিলোক কামোদ শুনেছেন তো—সেই নীর ভরন ক্যায়সে জাউঁ? ঠিক এই গানখানাই শুনবেন তোফাজ্জল হুসেন সাহেবের ঐ ভাগনের মুখে। আকাশ-পাতাল তফাত, যাকে বলে হেভ্‌ন্‌ অ্যাণ্ড হেল।"

আমরা অধৈর্য। আর তর সইছে না, বুক ফাটছে কৌতূহলে। কৌতূহল শীগগিরই মিটবে, ভরসা দিলেন নিমাই হালদার।…

তার পর একদিন।

শৌখিন মহা-বড়লোক রঞ্জন চৌধুরীর বাড়িতে ঘরোয়া গানের আসর। গাইতে এসেছেন জুলফিকার খাঁ। রঞ্জন চৌধুরী নিমাই হালদারের বিশিষ্ট বন্ধু।

গান শুনতে এসেছেন শহরের সেরা সেরা সঙ্গীত-বোদ্ধা, সেরা সেরা সংগীতজ্ঞ। আজ সেরা গান শোনাবেন শহরে এখানকার সেরা নামী গাইয়ে জুলফিকার খাঁ। শোনা গেল ফাউ হিসেবে আরেক জন গাইয়েও গান শোনাবেন। শোনা গেল না কে সেই গাইয়ে!

গান ধরলেন জুল্‌ফিকার খাঁ। সঙ্গত করলেন তবল্‌চী নিয়ামৎ খাঁ। বাঘা তবল্‌চী, জুলফিকারের চাচার প্রিয়তম দোস্ত। সঙ্গে সারঙ্গী বাজালে বিখ্যাত সারঙ্গী ওস্তাদ খাঁ। গান থামার সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হাততালি, কেয়াবাত, বলিহারি ইত্যাদির জগাখিচুড়ি। গর্বিত বিনয়ে গোঁফে তা দিলেন জুলফিকার খাঁ। নিয়ামত খাঁ বললেন "শুনলাম আর কে একজন নাকি গাইবেন। এর পর তিনি গাইবেন কি?" কণ্ঠে চ্যালেঞ্জের সুর, হাসিতে চ্যালেঞ্জের ইঙ্গিত— "এসো কার সাহস আছে এর পর গাইবার। এসো দেখি, গেয়ে কেমন জমাতে পার!"

এইবার উঠে দাঁড়ালেন গৃহস্বামী রঞ্জন চৌধুরীর বন্ধু আমাদের পাড়ার নিমাই হালদার। বললেন "এ গানের পর অন্য কারও গান গেয়ে জমানো শক্ত। কিন্তু জুলফিকার খাঁ সাহেবের একটু বিশ্রাম দরকার, সেই সময়টুকু ভরবার জন্যে যিনি গাইবেন তাঁকে নিয়ে আসছি।"

নিয়ে এসে বসালেন তাঁকে। পাতলা, মাঝারি গড়নের চেহারা পরনে পাজামা আর শেরওয়ানী, মাথায় তুর্কী টুপি, দুটি চোখ পুরু ফ্রেমের কালো কাচের চশমায় ঢাকা, গলা ঘিরে উলের মাফ্‌লার জড়ানো, পরিষ্কার কামানো মুখে ম্যাথামলিন হাসি লেগে আছে। লোকটি হয় সম্পূর্ণ অন্ধ, অথবা ক্ষীণদৃষ্টি। সম্ভবত একেবারেই অন্ধ।

"ইনি সম্প্রতি এসেছেন এলাহাবাদ থেকে।" পরিচয় দিতে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন নিমাই হালদার। "ওস্তাদ গুরগন খাঁ।"

গুরগন খাঁ ব্যস্তসমস্ত হয়ে হাত জোড় করে সবিনয়ে বললেন "মাফ কিজিয়ে। ম্যায় ওস্তাদ নহী হুঁ, এক মামুলী গাবৈয়া। গাবৈয়া ভি নহী, অভীতক থোড়া হি সীখা ম্যায়নে। আপ লোগ মেরা গানা শুনেঙ্গে, ইয়ে আপলোগোঁকী বড়ী হি মেহেরবানী।"

বিনীত প্রার্থনা পরম উদারতা দেখিয়ে মঞ্জুর করলেন ওস্তাদ জুলফিকার খাঁ। নিজের তানপুরো তুলে দিলেন দৃষ্টিহীন অথবা দৃষ্টিক্ষীণ গুরগন খাঁর হাতে, চাচা-প্রতিম নিয়ামৎ খাঁকে হেসে বললেন, গুরগন খাঁর সঙ্গে সঙ্গত করতে, ওস্তাদ মন্নু খাঁকে অনুরোধ করলেন গুরগন খাঁর সঙ্গে সারঙ্গী বাজাতে। তারপর পরম তাচ্ছিল্য দেখিয়ে গুরগন খাঁর দিকে পেছন ফিরে বসে ধূমপান করতে লাগলেন।

কিন্তু গুরগন খাঁ গান ধরতেই সারা আসরে শিহরণ জাগল। গানের মুখ ধরবার কী আশ্চর্য কায়দা। সেরা সেরা সমঝদারেরা তারিফ করে বলে উঠলেন "হায় হায় হায়!" সন্ত্রস্ত হয়ে আবার এদিকে ঘুরে বসলেন বাঘা ওস্তাদ জুলফিকার খাঁ। অনেকে লক্ষ্য করলেন, একটু যেন উদ্বেগের ছায়া পড়েছে তাঁর মুখে; আগেকার সেই বেপরোয়া তাচ্ছিল্যের ভাব আর নেই। আশ্চর্য সুর, আশ্চর্য লয়, আশ্চর্য মর্দানা অথচ মিঠে কণ্ঠস্বর গুরগন খাঁর। যাকে বলে বুলন্দ আওয়াজ। আর কি চমৎকার বন্দেজ আস্থায়ী অন্তরার!

চোখে চোখে কি যেন ইশারা বিনিময় হয়ে গেল তিন জনের ভেতর—জুলফিকার, নিয়ামৎ আর মন্নু খাঁ। নিয়ামৎ তবলার মহা প্যাঁচালো গাইয়ে-জব্দ করা বোল বাজাতে লাগলেন আড়ি কু-আড়িতে। লয়ের লড়াইতে নাকাল করবেন গুরগন খাঁকে। আসরে সবাই এ অশোভন ব্যাপার দেখে ক্ষুন্ন হলেন। গুরগন খাঁর গান মাটি করে দেবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে নাকি নিয়ামৎ তবল্‌চী!

গুরগন খাঁ বিনয় করে বললেন "সীধা ঠেকা বাজাইয়ে ওস্তাদ।"

ওস্তাদ নিয়ামৎ বিদ্রূপভরা কণ্ঠে বললেন "ক্যা আপ নয়া গাবৈয়া হ্যায় খাঁ সাহাব?"

গুরগন খাঁ মৃদু হাসলেন। আনাড়ী গাইয়ে, তবলায় একটু শক্ত বোল বাজালেই ঘাবড়ে যাচ্ছেন, এই বলে তাঁকে ঠাট্টা করছেন তবল্‌চী

নিয়ামৎ! বললেন "বহুৎ আচ্ছা, বাজাইয়ে য্যায়সী আপ্‌কী মরজী।" বলে বিষম ছন্দের শক্ত লয়ের তেলেনা ধরলেন একখানা :

"তানা ধিং তুম ত্রিতানা দেরে না, তানা দেরে না, তানা দেরে না।"

গুরগন খাঁকে লয়ের খেলায় বেকায়দায় ফেলতে গিয়ে নিজেই বেকায়দায় পড়ে গেলেন নিয়ামৎ খাঁ। কয়েকবার সমে পৌঁছতে ভুল করে ফেলে হাস্যাস্পদ হলেন। আহত, অবসন্ন, অসহায় ইঁদুরকে নিয়ে বেড়াল যেমন খেলা করে, নিয়ামৎ তবল্‌চীকে নিয়ে সেই রকম অবলীলাক্রমে খেলতে লাগলেন গুরগন খাঁ। লয়ের সমুদ্রে প্রাণপণে সাঁতার কাটতে কাটতে হাবুডুবু খেতে লাগল ঝানু তবল্‌চী নিয়ামৎ খাঁ। অনেক তবল্‌চী-জব্দ-করা লয়বাজ কালোয়াত গাইয়ের সঙ্গে সঙ্গত করে ঝাণ্ডা উঁচা রেখে এসেছেন তিনি, আজকের মত এমন নাকাল কোন দিন হয় নি। তাঁর ফরসা মুখখানা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। নিয়ামৎ কিছুতেই ঠিকমত লয়ে আসতে পারছেন না দেখে সাময়িকভাবে গান থামিয়ে আবার তেমনি মৃদু অনুকম্পার হাসি হাসলেন গুরগন খাঁ। নিয়ামৎ খাঁর হাত থেকে বাঁয়া তবলা টেনে নিয়ে বললেন "দেখিয়ে সাহাব, অ্যায়সে বজানা।" বলে নিজে বাজিয়ে দেখিয়ে দিলেন এ তেলেনার সঙ্গে কি ভাবে বাজালে ঠিক মিলবে। বিস্ময়ে 'কেয়াবাত' বলে উঠলেন নিজের অজ্ঞাতসারেই নিয়ামৎ খাঁ। নিজে গেয়ে গেয়ে সঙ্গে সঙ্গে কী নিখুঁত সঙ্গত আপন হাতে বাজাচ্ছেন গুরগন খাঁ। লয়ের ওপর এমন আশ্চর্য দখল তাঁর তবল্‌চী-জীবনে কমই দেখেছেন নিয়ামৎ। মানে মানে হার না মানলে পরে নাক আর কান দুই কেটে বিদায় নিতে হবে ভেবে নিয়ামৎ বললেন "গোস্তাকি মাফ কীজিয়ে ওস্তাদ।" অর্থাৎ অপরাধ হয়েছে, ক্ষমা করুন।

বোঝা গেল বিষদাঁত ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে নিয়ামতের, ওস্তাদ গুরগন খাঁ লয়ের প্যাঁচে তার মত কয়েকটি তবল্‌চীকে একসঙ্গে গুলে খেতে পারেন, একথা হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন নিয়ামৎ। গান-মাটি-করা

লয়-লড়াইয়ের সম্ভাবনায় উদ্বিগ্ন হয়ে ছিলেন আসরের সবাই, এবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। এইবারে সত্যিকারের সঙ্গীত হবে জমজমাট।

আমি বুঝলাম, আরও অনেকেরই বুঝতে বাকী রইল না এই গুরগন খাঁ-ই সংগীত-সিংহ ওস্তাদ তোফাজ্জল হুসেন খাঁ সাহেবের সেই আশ্চর্য ভাগনে, দীর্ঘ গোপন সাধনার পর প্রকাশ্য আসরে গান গাওয়া তাঁর এই প্রথম। এঁর গান শুনে মুখ চুন করে বসে আছেন জুলফিকার খাঁ।

আমাদের পাড়ার যাঁরা ঝাঁক বেঁধে গিয়ে জাঁকিয়ে বসেছিলেন, তাঁরা প্রায় একমত হয়েই ফরমাশ করলেন তিলক কামোদ। বড় মিঠে এই রাগিণী। আর এই তিলক কামোদই গেল বছর আমরা শুনেছি পাড়ার গাইয়ে গগন খাজাঞ্চির মুখে।

"নীর ভরন ক্যয়সে জাউঁ সখিরি"—চেঁচিয়ে বললেন দীণেন শাসমল, বঙ্কিম ভট্‌চার্যি, আরো অনেকে।

ফরমাশ রাখলেন গুরগন খাঁ। গাইলেন ঐ গানখানাই। দেখা গেল যেমন বন্দেজে গাইতেন গগন খাজাঞ্চি, খাঁ সাহেবের আস্থায়ী অন্তরার বাণী এবং বন্দেজ সেই একই রকম। শুধু......

"কিন্তু খাঁ সাহেবের কি আশ্চর্য গায়ন ভঙ্গী লক্ষ্য করেছ?" বললেন আমাদের পাড়ার সমঝদারেরা। "ওস্তাদ তোফাজ্জল হুসেন খাঁ সাহেবের ভাগনে না হয়ে যায় না।"

গানের শেষে তবল্‌চী নিয়ামৎ খাঁ আর সারঙ্গী ওস্তাদ মন্নু খাঁ পর্যন্ত জুলফিকার খাঁর উপস্থিতি ভুলে গিয়েই উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন:

"অ্যায়সা তিলক কামোদ কভী নহী শুনা খাঁ সাহাব। কহিয়ে ইয়ে তোফাজ্জল হুসেন খাঁ সাহাবকা তালিম হ্যায় না?"

"খুদাকা মেহেরবাণী, ঔর—" হাসলেন ওস্তাদ গুরগন খাঁ, কথাটা সমাপ্ত না করেই।

এর পর আমাদের পাড়াতেও কয়েকটা বৈঠকে আমরা গাওয়ালাম ওস্তাদ গুরগন খাঁ সাহেবকে। নিমাই হালদারের একান্ত অনুরোধেই

গাইতে রাজী হলেন খাঁ সাহেব। বললেন অবশ্য, "অভীতক কুছ নহী সীখা। ক্যা সুনাউঁ ?"

খাঁ সাহেব! খাঁ সাহেব! খাঁ সাহেব! আমাদের পাড়ার মহামানব হয়ে উঠলেন তিনি। এমন গাইয়ে আর হয় না। অতুলনীয়! অপ্রতিদ্বন্দ্বী! অভূতপূর্ব! ওস্তাদ তোফাজ্জল হুসেন খাঁকে অনায়াসে ছাড়িয়ে যাবেন গুরগন খাঁ। পাড়ার অনেক গাইয়ে কোমর বাঁধলেন গুরগন খাঁকে এখানেই ধরে রাখবেন, আর তালিম নেবেন তাঁর কাছে। এমন ক্ষণজন্মা ওস্তাদকে ছাড়া যায় না।

কিন্তু এক দিন হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে গেল। ভাঙ্‌লেন গুরগন খাঁ নিজেই। তুর্কী টুপি আর চোখের ঠুলি খুলে ফেলে স্বপরিচয়ে প্রকাশ করলেন নিজেকে—তিনি গগন খাজাঞ্চি। গুরগন খাঁ তাঁর ছদ্মবেশ মাত্র!

এর পর দিন দশেকের ভেতরই সবাই বুঝে ফেললেন তাঁর গান আসলে উঁচুদরের নয়। কাশীধামেই সুতরাং ফিরে যেতে হল গগন খাজাঞ্চিকে।

আবার আসর জাঁকিয়ে বসলেন ওস্তাদ জুলফিকার খাঁ। বিপিন চাটুয্যে বললেন "এ হল খানদানী গুণী। এর সাম্‌নে ফাঁকিবাজি কদিন টেঁকে? গগন খাজাঞ্চি কি না—হেঃ হেঃ হেঃ—"

*

* *

ঝিমুতে ঝিমুতে সহসা মনে হলো ট্রেনটা চলার বেগে প্রচণ্ড মাত্‌লামি শুরু করেছে; কখনো লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে কখনো ডাইনে বাঁয়ে হেলে দুলে দুরন্ত বেগে এগিয়ে চলেছে অন্ধকার ভেদ করে আরো অন্ধকারের দিকে। দূর থেকে যেন ভেসে আস্‌ছে মকবুল হোসেনের শেষ সানাইর সুর। কানের সামনে কে যেন গুন্‌ গুন্‌ করে গাইছে "মনে করো শেষের সেদিন ভয়ংকর।"

একটি ইঞ্জিন টেনে নিয়ে চলেছে নানা জাতের, নানা ভাষার, নানা বয়সের নরনারীতে বোঝাই অনেকগুলো কামরা। এতগুলো মানুষের জীবন মরণ ঐ ইঞ্জিন ড্রাইভারের হাতের মুঠোয়। তারি ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে প্রায় সবাই নিশ্চিন্ত—পাকা ড্রাইভার, ট্রেনটি ঠিকই চালিয়ে নিয়ে যাবে। হোক অন্ধকার, আসুক দুর্যোগ, কোনো ভাবনা নেই। পাকা কাণ্ডারী, যাত্রিদের হুঁশিয়ার হবার দরকার নেই কোনো। ট্রেনের লম্ফ ঝম্ফ আর দোদুল দুলুনি তাই পারে নি অনেকের ঘুম বা তন্দ্রা ভাঙাতে। ড্রাইভারের ওপর তাদের অগাধ বিশ্বাস, অসীম নির্ভর, গোটা ট্রেনকে চোখের সামনে সোজা জাহান্নামের দিকে চালিয়ে নিলেও এরা বিশ্বাস করবে ট্রেন চলেছে নিশ্চিত স্বর্গ-ধামে।

কিন্তু আমার পেছনের কামরায় যেন টলে উঠেছে বিশ্বাস, হারিয়ে গেছে ভরসা। আগে যেখানে ছিল সন্দেহের দোলা, সেখানে এসেছে নিশ্চিত, সংশয়াতীত, বদ্ধমূল মহাভয়। চরম খেপা খেপেছে ড্রাইভার, পুরো বেহুঁশ হয়ে গেছে চরম মাত্‌লামির নেশায়। এই চূড়ান্ত খ্যাপা চূড়ান্ত মাতাল খামখেয়ালী ড্রাইভারের ইঞ্জিন পরিচালনায় মস্ত লম্বা ট্রেনটি হু হু করে এগিয়ে চলেছে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে। ব্রেক খারাপ হয়ে গেছে ইঞ্জিনের, ব্রেক কষ্‌তে এক ফোঁটা রাজিও নয় ড্রাইভার। ড্রাইভারকে সাম্‌লাবার কেউ নেই। পেছনে গার্ড আছেন বটে; ভ্যাকুআম ব্রেক কষে দেওয়ার হক তার আছে। কিন্তু ড্রাইভারকে ঘাঁটাবার ঝামেলায় পা বাড়াতে রাজি নন তিনি। কামরায় কামরায় বিকল হয়ে রয়েছে ট্রেন থামাবার শিকল।

বাইরে মহাদুর্যোগের ঘনঘটা—চলতি ট্রেনের সামনে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে। মাঝে মাঝে হঠাৎ লাগছে কালো হাওয়ার প্রচণ্ড ধাক্কা। মনে হতে লাগল পালিয়ে এসেছি বটে শকুন্তলা স্যানাটোরিআম

থেকে, কিন্তু ঘরে ফেরা হয় তো আর হয়ে উঠবে না, খ্যাপা মাতাল ড্রাইভারের হাতে এ ট্রেনের আর নিস্তার নেই। হায় রে অসহায় যাত্রিদল!

হঠাৎ খেয়াল করা গেল চলতি ট্রেনের এ কামরায় আমি একা নই, ও ধারে বসে আছেন অপরূপা এক নারী মূর্তি! দেখি নি, কিন্তু তবু মনে হলো শকুন্তলা স্যানাটোরিআমে এঁকে দেখেছি, অন্তত দেখা উচিত ছিল। এঁর সারা চেহারা জুড়ে কেমন একটা অনির্বচনীয় শকুন্তলা শকুন্তলা ভাব। আমার মনে সন্দেহের উদয় হলো। আমি প্রশ্ন করলাম "আপনিই কি······ ?"

নারীমূর্তি কোনো জবাব না দিয়ে নিজের যুগল অধরের মাঝখানে খাড়া তর্জনী চেপে ইশারায় জানালেন "চুপ!" আমি চুপ করে গেলাম বটে, কিন্তু মন থেকে সেই সন্দেহটিকে মুক্তি দেবার ক্ষমতা আমার হলো না। এই সহসা আবির্ভূতা নারী মূর্তিকেই আমি মনে মনে চিনে নিলাম শকুন্তলা বলে।

বললাম "ড্রাইভারের নিজের কি ভয় নেই? গোটা ট্রেন মারা পড়লে ড্রাইভার নিজেই কি বাঁচবে? ট্রেনকে খাদে ফেললে সে কি নিজেও খাদে পড়বে না?"

শকুন্তলা বললে না কিছু, মৃদু হাসলে শুধু। কিন্তু কি আশ্চর্য ভাষাময় সেই নীরব হাসি! আমি পরিষ্কার শুনতে পেলাম সেই হাসিতে শকুন্তলা বলতে চাইছে "না। ড্রাইভার নিজের সম্বন্ধে অত কাঁচা ছেলে নয়; ট্রেন খাদে পড়বার আগেই লাফিয়ে পড়ে পগার পার হয়ে যাবে। পরের বেলায় যত খ্যাপা আর যত মাতালই হোক না কেন, নিজের বেলায় সে তালে ঠিক। সব ড্রাইভারই কম বেশি তাই হয়ে থাকে, বিশেষ করে—"

সহসা একি! এই প্রবীণ ভদ্রলোকটিকে তো এতক্ষণ খেয়াল করি নি। এঁর দু হাত এবং মাথা ঘন ঘন আন্দোলিত হচ্ছে, মুখ

থেকে নির্গত হচ্ছে বাণী অবিরাম ধারায়। শুনে কখনো কখনো মনে হচ্ছে এ তাঁর দ্বিতীয় শৈশব, কখনো বা............

আমার চিন্তাধারায় বাধা দিয়ে শকুন্তলা শুধালে "এঁকে চিনতে পারলেন ধনপতিবাবু?"

চেনা চেনা লাগছিল। তবু বললাম "কে ইনি?"

শকুন্তলা বললে "এঁকে একজন বিশেষ ব্যক্তি বলেও ধরতে পারেন, অথবা প্রতীক বা প্রতিনিধি বলেও মনে করতে পারেন। অসংখ্য নরনারীর বর্তমান আর ভবিষ্যত, কল্যাণ আর অকল্যাণ এঁর করায়ত্ত। কল্যাণ করতে পারুন আর না পারুন, অকল্যাণ করবার ক্ষমতা এঁর অসীম। ইনি একজন বহুজনগণভাগ্যবিধাতা। ইনি একজন একচ্ছত্র মহাকর্ণধার, এঁর কর্ণধারণ করবার কেউ নেই। ভেবে দেখুন গোটা দেশের ভবিষ্যত এঁর খামখেয়ালের ওপর ছেড়ে দিয়ে প্রায় গোটা দেশ ঘুমিয়ে আছে, বুঝেও বুঝতে চাইছে না মহাকর্ণধারের এখন স্যানাটোরিআমে বিশ্রাম দরকার।"

আমি শিউরে উঠলাম শকুন্তলার কথা শুনে। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ দুলে উঠল গাড়ি। মাতাল উন্মাদ বেপরোয়া ড্রাইভার বাধাহীন খামখেয়ালে সমস্ত ট্রেনটাকে কি বীভৎস পরিণামের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে কে জানে?

বললাম "উপায় কি নেই, শকুন্তলা?"

শকুন্তলা বললে "জানিনে আছে কিনা। জানিনে কি উপায় আছে। এই শুধু জানি যে যাঁদের আসল ঠাঁই স্যানাটোরিআমে, তাঁদের অনেককেই স্যানাটোরিআমে না পাঠিয়ে বিধাতা বসান বহুজনভাগ্যবিধাতা কর্ণধারের গদিতে। বিধাতার সেই উন্মাদ খামখেয়ালের মাশুল জুগিয়ে মরে অগুন্‌তি হতভাগ্য শিশু-বৃদ্ধ-নর-নারী। আহা, যদি এই কর্ণধারদের কোনোরকমে ভুলিয়ে ভালিয়ে স্যানাটোরিআমে পাঠানো যেত!"

একটা বিরাট দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো শকুন্তলার বক্ষ থেকে। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল শকুন্তলা, দুনিয়ার নিদারুণ ট্র্যাজেডির কথা ভেবে।

কান্না উঠল আমারও হৃদয়ের দুকূল ছাপিয়ে। চিৎকার করে উঠলাম "শকুন্তলা! শকুন্তলা!"

কিন্তু একি! কোথায় শকুন্তলা? কোথায় সেই মহাভাষণরত প্রবীণ মহাকর্ণধার? কোথায় মহাদুর্যোগের ঘনঘটা? দেখলাম কামরায় আমি ছাড়া আর কেউ নেই। বাইরে ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি, মৃদু মৃদু রোদ। ট্রেন পোঁছে গেছে এ লাইনের শেষ স্টেশনে।

একা নামলাম ট্রেনের কামরা থেকে।